KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আতাউর রহমান
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৯/১ ৯/২ ৯/৩ ৯/৪	Year of Publication : বৈশাখ - আষাঢ় ১৩৫৪ শ্রাবণ - আশ্বিন ১৩৫৪ কার্তিক - পৌষ ১৩৫৪ মাঘ - চৈত্র ১৩৫৪ Condition : Brittle / Good ✓
Editor : হুমায়ুন কবির	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

চতুরঙ্গ

হুমায়ুন কবির
সম্পাদিত
ত্রৈমাসিক পত্রিকা
শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৪

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ

মধুময় হউক আমাদের জীবন, আনন্দময় হউক শারদীয় দিনগুলি

পূর্ব রেলওয়ে

ER/PA/C

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ত্রৈমাসিক পত্রিকা **চতুরঙ্গ** শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৪

॥ সূচীপত্র ॥

হুমায়ুন কবির ॥ আঠারশো সাতান্ন ১১৫

সুরেন সেন ॥ কানপুরের কথা ১২৭

শার্ল বোদলেয়ার ॥ গরিবের মৃত্যু ১৩১, প্রেমিক-প্রেমিকার মৃত্যু ১৩২,
শিল্পীদের মৃত্যু ১৩৩, এক অদ্ভুত মানুষের স্বপ্ন ১৩৪
রক্তের ফোয়ারা ১৩৫ অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

অমলেন্দু বসু ॥ সমালোচনার পদ্ধতি ১৩৬

লীলা মজুমদার ॥ চীনে লণ্ঠন ১৪৫

অতীন বসু ॥ ইতিহাসে যৌনবৃত্তি ১৯০

শশীভূষণ চৌধুরী ॥ আধুনিক সাহিত্য ১৯৫

সমালোচনা—কাজী আব্দুল ওদুদ, সরোজ আচার্য, চিদানন্দ দাশগুপ্ত,
নৃপেন্দ্র সান্যাল ও কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ২০৩

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

ছুটিতে **দার্জিলিঙ**

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স প্লেনে যান

কলিকাতা থেকে বাগডোগরা

(রোজ সকালে ও বিকেলে সার্ভিস)

ছুটির দিনগুলি অমূল্য—যাতায়াতে যত কম সময় লাগে ততই ভালো। আই-এ-সি প্লেনে যান—দু'ঘন্টারও কমে পরম আরামে পাহাড়ী অঞ্চলে পৌঁছে যাবেন। কলকাতা থেকে এক কদমে বাগডোগরা। সেখান থেকে মনোরম মোটরপথে দার্জিলিঙ—যার জলবায়ু তার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের মতোই আশ্চর্য। খেলাধুলোয় মহানন্দে সময় কাটান—ঘোড়ায় চড়ুন, ঘোড়দৌড়ে যান, মৎস্য কিম্বা পক্ষী শিকারে মেতে থাকুন।

আপনি যদি দিল্লী কিম্বা বম্বেবাসী হন—দমদম থেকে তৎপর বাগডোগরার প্লেন পাবেন। ফিরতিপথে বাগডোগরা থেকে সকালের প্লেনেই সুবিধে—প্রাতরাশের পরই দার্জিলিঙ ত্যাগ, তারপর নৈশভোজনের পূর্বেই দিল্লী প্রত্যাগমন।

ছাত্রদের জন্য কম ভাড়ার ব্যবস্থা আছে।

অনুসন্ধান বা রিজার্ভেশনের জন্য এই ঠিকানা—

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্পোরেশন

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা
ফোন: ২৩-৫১৪১ (৬ লাইন)

ঊনবিংশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা **চতুরঙ্গ** শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৪

আঠারোশো সাতান্ন

হুমায়ুন কবির

আঠারোশো সাতান্ন সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বিশেষ করে আওধ এবং রোহিলাখণ্ডে ইংরেজ শাসনতন্ত্রের সঙ্গে ভারতীয় সিপাহী এবং জনসাধারণের যে সংঘর্ষ ঘটেছিল, এ বছর দশই মে তারিখে আমরা তার শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছি। এ বছর পনেরোই আগস্ট ভারতীয় স্বাধীনতার দশ বৎসর পূর্ণ হল। সেদিন এবং পরের দিন স্বাধীনতার উৎসবে শত বৎসরের পুরাতন আন্দোলনের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করে অতীত এবং বর্তমান জাতীয় জাগরণের ইতিহাসকে আমরা একসূত্রে গাঁথবার চেষ্টা করেছি। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে ১৮৫৭ সালে যে সব ঘটনা ঘটেছিল, এবং গত ষাট সত্তর বছর স্বাধীনতার আন্দোলন যেভাবে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধকে উদ্বুদ্ধ করেছে—তাদের প্রকৃতি ও বিকাশের মধ্যে কি কোন ঐক্যের পরিচয় মেলে? দশই মে তারিখের বিশেষ কোন তাৎপর্য আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ বা প্রশ্ন ওঠাও বিচিত্র নয়।

একটা কথা প্রথমেই বলে নিই—মানুষের ইতিহাসে আকস্মিক আবির্ভাবের স্থান নেই বললেই চলে। কালপ্রবাহকে আমরা নিজেদের সুবিধার জন্য নানাভাবে ভাগ করি, কিন্তু নববর্ষ বা নবযুগ কোন এক বিশেষ দিনে সুরু হয় না। ১৮৫৭ সালের দশই মে তারিখে ভারতীয় জনসাধারণ বা সিপাহীর অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ হল এবং তারা ইংরেজের বিরুদ্ধে হাতিয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল, ইতিহাস এমন কথা বলে না। বহুদিনব্যাপী চেষ্টার ফলে ইংরেজ ভারতবর্ষে রাজ্যস্থাপন করেছিল, একদিন বা এক বৎসরে এদেশে তাদের শাসন কায়েম হয়নি। সিপাহী বিদ্রোহের পত্তনও ঠিক তেমনিভাবে একদিনে বা এক বৎসরে হয়নি—বহুদিনের ধূমায়িত অসন্তোষ ছোটখাট বহু বিস্ফোরণ ও আন্দোলনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে, আঠারোশো সাতান্ন সালে তার-ই একটি বিরাট ও ব্যাপক প্রকাশের পরিচয় মেলে। বস্তুতপক্ষে একথা বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না যে ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে শাসকের ভূমিকায় যেদিন ইংরেজের প্রথম আবির্ভাব, সেইদিন থেকেই ভারতীয় মানসে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অঙ্কুরিত হয়ে দেখা দিয়েছে।

ইতিহাসের এ ধারাবাহিকতাকে মনে প্রাণে মেনে নিলে আঠারোশো সাতান্ন সালের

তাৎপর্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ১৮৫৭ সালের দশই মে তারিখের হয়তো দিন হিসাবে বিশেষ কোন মর্যাদা নেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সে বৎসর সে দিনে যে বিপ্লব সুরু হয়েছিল, মানবাত্মার চিরকালের মুক্তি সন্ধানের পরিচয়ই তার মধ্যে মেলে। ১৮৫৭ সালের বহুদিন পূর্বে তার উদ্ভব, এবং বহুদিন পরেও আজো তার জের শেষ হয়নি। ইংরেজশক্তির বিরুদ্ধে সিপাহীর যে বিদ্রোহ, মূলত তা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের বিদ্রোহ। ১৮৫৭ সালের পূর্বেও তা ঘটেছে এবং পরেও বারবার আমরা সে বিদ্রোহের পরিচয় পাই। যুগে যুগে কালে কালে অত্যাচার, অত্যাচারী এবং অত্যাচারিতের বাইরের রূপ বদলায়। তাই বিপ্লব ও বিদ্রোহের প্রকৃতি ও ধারারও অদলবদল হয়, কিন্তু সমস্ত পার্থক্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত লক্ষ্য এক বলে মানুষের আত্মা বিভিন্ন যুগের সমস্ত বিপ্লব ও বিদ্রোহের মধ্যে নিজেদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়।

বহুযুগ ধরে ধীরে ধীরে ইংরেজ এদেশে রাজ্যস্থাপন করে। তারা যে ভারতবর্ষ জয় বা এদেশে শাসন স্থাপন করতে চায়, বহুদিন পর্যন্ত তাদের কার্যকলাপে তার কোনো ইঙ্গিত মেলেনি। পর্তুগীজদের মনে প্রথম থেকেই সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা হয়তো ছিল, কিন্তু গোড়ায় বোধ হয় ইংরেজদের এরকম কোন অভিসন্ধি ছিল না। বস্তুতপক্ষে ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনের জন্য ফরাসীরাই অনেকখানি দায়ী। প্রথমে ইংরেজ এবং ফরাসী দুই-ই বাণিজ্যের উপলক্ষে এদেশে আসে। কারবারী হিসাবে যুদ্ধ বিগ্রহের চেয়ে ব্যবসায়ে নিরাপত্তা এবং কারবারের মুনাফার প্রতিই তাদের বেশী লক্ষ্য ছিল। রাজসরকারের সাহায্য পেলে যে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুবিধা হয়, সে কথা আবিষ্কার করতে অবশ্য তাদের বেশী দিন লাগেনি। তাই প্রথমে ফরাসী এবং পরে ইংরেজ চেষ্টা করেছে যে স্থানীয় রাজ-রাজড়ার ঝগড়ায় অংশ নিয়ে নিজেদের পছন্দ মত দরবার স্থাপনে সাহায্য করে। ফরাসীরা দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে সিংহাসনের উমেদারদের মধ্যে নিজেদের মনোনীত প্রার্থীকে সাহায্য করতে অগ্রসর হয়েছিল বলে তার প্রতিক্রিয়ায় ইংরেজও স্থানীয় দরবারী ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করতে সুরু করে। পছন্দমত রাজা বা নবাবকে সাহায্য করেই তারা প্রথমে তুষ্ট ছিল, দেশীয় রাজ্যশাসনের ব্যাপারে একবার হস্তক্ষেপ করতে সুরু করলে শেষ পর্যন্ত তার ফল যে কোথায় গিয়ে শেষ হবে, বহুদিন পর্যন্ত ইংরেজ সে কথা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করবার পরেও বহুদিন পর্যন্ত ইংরেজ তাই দেশ শাসনের ব্যাপারে বেশী উৎসাহ দেখায়নি। অল্পদিনে বেশী লাভ কি ভাবে করা যায় তাই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

ইংরাজেরা সচেতন বা সক্রিয়ভাবে ভারতবর্ষ জয়ের কথা প্রথমে না ভাবলেও দূরদৃষ্টি ভারতীয় রাজনৈতিকের চোখে এ নতুন বিপদের সম্ভাবনা প্রথম থেকেই ধরা দিয়েছিল। নবাব সিরাজউদ্দৌলার বহু দোষ ছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে অনেক কথা বলা চলে, কিন্তু এদেশে ইংরাজের আগমন যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে ব্যাহত করতে পারে সেকথা তিনি গোড়া থেকেই বুঝেছিলেন। তীক্ষ্ন রাজনৈতিক মনীষায় যে বিপদ তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল, সে বিপদ জয় করবার মতন সামরিক প্রতিভা বা শাসন ক্ষমতা কিন্তু তাঁর ছিল না। তাই তিনি পরাজিত ও নিহত হলেন। পরে মীরকাশিম কোম্পানীর কর্মচারীদের অত্যাচার বন্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন—তিনিও সফলকাম হননি। ইংরাজের শক্তিকে ব্যাহত করবার এ ধরনের চেষ্টা প্রথম থেকেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হয়েছে, কিন্তু সে চেষ্টা বিচ্ছিন্ন ও অসংবদ্ধ বলে কৃতকার্য হয়নি। ইংরাজ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভাগ ও বিভিন্ন রাজারাজড়ার

মতান্তর ও মনান্তরকে অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে ব্যবহার করেছে এবং তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সুবিধা নিয়ে নিজেদের সাম্রাজ্য কায়েম করেছে। হায়দার আলী ইংরাজ সৈন্যদলকে বারবার পরাজিত করেছেন, কিন্তু নিজাম ও মারাঠারা ইংরেজকে সাহায্য করায় দাক্ষিণাত্যে ইংরেজশক্তির উচ্ছেদ করতে পারেননি। নিজাম ও মারাঠাদের সাহায্য না পেলে টিপু সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধে ইংরেজ পেরে উঠত কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহ করা চলে। টিপু সুলতানের মৃত্যুর পরে মারাঠাদের সঙ্গে যখন ইংরেজের সংঘর্ষ বাধল, তখনও নিজাম এবং অন্যান্য ভারতীয় রাষ্ট্রের সাহায্য না পেলে ইংরেজ এত সহজে জয়লাভ করতে পারত না। বস্তুতপক্ষে ভারতবর্ষে আগমনের প্রথম দিন থেকেই যখনি ইংরেজ এদেশে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহে যোগ দিয়েছে, তখনি এক ভারতীয় রাজশক্তির বিরুদ্ধে অন্য ভারতীয় রাজশক্তিকে ব্যবহার করেছে। তাদের সৈন্যবাহিনীতেও ভারতীয় সিপাহী না থাকলে কেবল বিদেশাগত সৈন্য নিয়ে তাদের শাসন বা যুদ্ধবিগ্রহ কোন দিনই চলত না।

উনিশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পরে ভারতবর্ষে ইংরেজের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না, কিন্তু তবু ইংরেজ প্রকাশ্যভাবে রাজমর্যাদা দাবী করেনি, তখনো মোগল সম্রাটের আনুগত্য অন্তত মুখে স্বীকার করেছে। শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বোধ হয় তার প্রথম ব্যতিক্রম ঘটে এবং ইংরেজ বণিক কোম্পানীর কর্ম ও ব্যবহারে রাজশক্তির লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। ভারতীয় সিপাহী এবং ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভও তখন থেকে দানা বাঁধতে সুরু করে। আঠারো শতকেও ইংরেজের বিরুদ্ধে আক্রোশ ও বিদ্রোহ এখানে-ওখানে দেখা দিয়েছে, কিন্তু ইংরেজের বেতনভুক্ত সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ উনিশ শতকের গোড়াতেই প্রথম মূর্ত হয়ে উঠল। কেবল জাতীয়তার আহ্বানে সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছিল মনে করলে ভুল হবে, কারণ উনিশ শতকের গোড়ায় ভারতীয় জাতীয়তা বোধের জন্ম হয়নি। ১৮৫৭ সালের প্রায় বিশ পঁচিশ বৎসর পরে শতকের শেষের দিকেই প্রথম এদেশে জাতীয়তাবোধের বিকাশ দেখা দেয়—তবু শতকের প্রারম্ভেই মাদ্রাজ বা বাঙলাদেশে সিপাহীদের মধ্যে যে বিক্ষোভ, বিকাশ উন্মুখ জাতীয়তাবোধই তার অন্যতম কারণ। দেশের বিভিন্ন রাজশক্তিকে ধ্বংস করে বিদেশী ইংরেজ দিনে দিনে নিজের রাজত্ব কায়েম করছে, ধীরে ধীরে সমস্ত ক্ষমতা ও সমস্ত অর্থ সম্পদ ইংরেজের কবলে চলে যাচ্ছে, ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের হাতের পুতুলে পরিণত হচ্ছে, ভারতীয় সমাজব্যবস্থা ও ধর্মবিশ্বাসেও ইংরেজ হস্তক্ষেপ করতে সুরু করছে, এই বোধ থেকেই সিপাহীদের মনে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে সুরু করে। স্থানীয় ও সাময়িক বিক্ষোভের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলে কিন্তু এ সমস্ত আকস্মিক বিদ্রোহ ও বিস্ফোরণকে জাতীয় আন্দোলন বলা চলে না। ১৮৫৭ সালে তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহ ব্যাপক রূপ নিয়ে ভারতবর্ষের বিরাট অংশে দেখা দিল বলে প্রথম জাতীয় আন্দোলনের গৌরব তারই প্রাপ্য।

সিপাহী বিদ্রোহের কারণ ও স্বরূপ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে ও বোধ হয় চিরদিনই থাকবে। অধিকাংশ ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা সামরিক বিক্ষোভ হিসাবেই তাকে বুঝতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে ১৮৫৭ সালের ঘটনাকে রাষ্ট্র সংঘর্ষ বা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব মনে করা ভুল হবে। তাঁরা বলেন যে, প্রধানত সিপাহীরাই বিদ্রোহ করেছিল এবং সিপাহীদের মধ্যেও বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে দেখা দেয়নি। ভারতবর্ষে সেকালে ইংরেজদের তিনটি প্রধান সেনাদল ছিল, বঙ্গ-বাহিনী, বম্বে-বাহিনী ও মাদ্রাজ-বাহিনী। তিনটির মধ্যে কেবলমাত্র বঙ্গবাহিনীই ব্যাপকভাবে বিদ্রোহ করে। মাদ্রাজ ও বোম্বাই

অঞ্চলের কথা ছেড়ে দিলেও হায়দরাবাদে, বাঙলাদেশে বা পঞ্জাবে তেমন কোন ব্যাপক আন্দোলন দেখা দেয়নি। তাঁরা স্বীকার করেন যে আওধ বা রোহিলাখণ্ডে বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে জাতীয় আন্দোলনের রূপ ধারণ করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও তাঁরা বলেন যে সেখানেও জনসাধারণের মধ্যে ইংরাজের সমর্থকের পরিচয় মেলে। ১৮৫৭ সালের আন্দোলন যে সিপাহীদের বিদ্রোহ তার প্রমাণ দিতে গিয়ে তাঁরা বলেন যে, সিপাহীদের মধ্যেই বিক্ষোভ তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল, রাজারাজড়া এবং জনসাধারণ বহুক্ষেত্রে সে আন্দোলনে নিষ্ক্রিয়। দেশের সর্বত্রই মধ্যবিত্ত সমাজ ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যে ইংরেজ রাজশক্তির সহায়তা করেছে সে কথারও তাঁরা বারবার উল্লেখ করেছেন।

ঐতিহাসিকদের মধ্যে আরেকদল মনে করেন যে ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসে ইংরেজ হস্তক্ষেপ করেছিল বলেই সিপাহীরা বিদ্রোহ করে। তাঁদের মধ্যে ইংরেজ ও ভারতবাসী দুয়েরই পরিচয় মিলবে। এ মতের স্বপক্ষে যুক্তিও অনেক রয়েছে। সে সময়ের ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই মনে হয়েছিল যে ইংরাজ এদেশে খৃস্টধর্ম প্রচারের জন্য ভারতীয় আচার ও বিশ্বাসকে নানাভাবে আঘাত করছে। ভারতীয়দের মধ্যে যাঁরা দূরদর্শী, তাঁরা দাবী করেছিলেন যে ইয়োরোপীয় শিক্ষাদীক্ষা ও বিজ্ঞানের এদেশে প্রচলন হোক। দেশের জনসাধারণ ও বিশেষ করে দেশী সিপাহী কিন্তু ইংরিজী ভাষার প্রচলন ও উচ্চশিক্ষার প্রবর্তনের মধ্যে স্বধর্মনাশ ও খৃস্টধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু দেখেনি। সতীদাহ প্রথার বিলোপ ইংরাজ শাসনের অন্যতম সুফল, কিন্তু সেদিন ভারতীয় সিপাহী তাকে ধর্মব্যবস্থায় অকারণ হস্তক্ষেপ মনে করেছে। চর্বি মেশানো টোটা নিয়েই যে সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রপাত হল, তাতেই বোঝা যায় যে বিদ্রোহের মূলে সরল ধর্মবিশ্বাস ও অন্ধ কুসংস্কার কিভাবে কাজ করেছে। তবু কেবল ধর্ম ও সংস্কার দিয়ে সিপাহী বিদ্রোহকে বোঝা যায় না। সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেছে রাজা রাজন্যেরা, মৌলবী মোল্লা পুরোহিত পাণ্ডা সাক্ষাতভাবে কোথাও নেতৃত্ব করেছে তার নিদর্শন মিলবে না। সিপাহী এবং তাদের নেতৃবর্গ জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাসকে ব্যবহার করেছে, কিন্তু কোন ধর্মগুরুকে নেতা বলে মানেনি। বাহাদুর শাহ, নানা সাহেব, তান্তিয়া টোপী, বখত খাঁ বা ঝাঁসির রানী এঁরা কেউই ধর্মের আহ্বানে ধর্মকে কেন্দ্র করে আন্দোলনে যোগদান করেননি।

আরেকদল ঐতিহাসিকের মতে অর্থনীতিকে কেন্দ্র করেই ইতিহাসের ধারা বয়ে চলে, তাই দেশের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের ফলেই ১৮৫৭ সালে গণবিপ্লব দেখা দিয়েছিল। তাঁরা একথাও বলেন যে, ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের পূর্বে ভারতবর্ষ প্রকৃত অর্থে কোনদিন পরাধীন হয়নি। বিদেশী অভিযাত্রী এদেশে অনেক এসেছে, কিন্তু দু-এক পুরুষের মধ্যেই তারা ভারতবাসীতে রূপান্তরিত হয়েছে। আদিকালে আর্য অভিযাত্রীরা বিজেতার রূপে প্রথম দেখা দিয়েছিল, কিন্তু প্রথম দিন থেকেই এদেশে বসতিস্থাপন ছিল তাদের লক্ষ্য। তার পরে দীর্ঘ দু'হাজার বৎসরের ইতিহাসে সেই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তির পরিচয় বারবার মেলে। শক হূন তাতার পাঠান মোগল সবাই এদেশের বাসিন্দা হিসাবেই এখানে রাজত্ব করেছে। মহম্মদ ঘোরীকে হয়তো বিদেশী মনে করা চলে কিন্তু তিনি ভারতবর্ষ শাসন করেননি। কুতবুদ্দিন ভারতবর্ষের প্রথম পাঠান সম্রাট। ভারতবর্ষের বাইরে তাঁর কোন স্বার্থ বা আকর্ষণ ছিল না। পরবর্তী পাঠান শাসকদের প্রায় সকলেই ভারত-জাত। বাবর বিদেশ থেকে এসেছিলেন, কিন্তু ভারতে রাজ্যস্থাপনের পরে ভারতবর্ষই তাঁর দেশ হয়ে দাঁড়াল। পরবর্তী মোগল সম্রাটরা যে ভাবে ভারতবর্ষকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন, তার ফলে

বাইরের পৃথিবীতে ভারতীয় সম্রাটের কথা বললে আজো প্রধানত ও প্রথমত মোগল বাদশার কথাই মনে আসে। ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করে ভারতবাসীদের শাসন করেও বিদেশী রয়ে গেছে, ইংরাজ আসবার আগে এদেশের ইতিহাসে তার নজীর মিলবে না।

ইংরেজ বিদেশী রয়ে গেল বলে তারা ভারতবর্ষকে যে ভাবে শোষণ করেছে, তারও তুলনা এদেশের ইতিহাসে মিলবে না। পূর্বে যখন কোন রাজা প্রজার উপর অত্যাচার করেছে, জনসাধারণের অর্থ লুণ্ঠন করেছে, তখনো সে অর্থ দেশের বাইরে চালান হয়ে যায়নি। শোষিত সম্পদ দেশের মধ্যেই থাকত, দেশর মধ্যেই খরচ হোত বলে দেশবাসীর কোনদিন পুরোপুরি ষোল আনা লোকসান হয়নি। তৈমুরলঙ্গ বা নাদিরশাহ লুণ্ঠিত অর্থ নিয়ে চলে গেছেন, কিন্তু তাঁরা কোনদিন ভারত শাসন করবার দাবী করেননি। ইংরেজই প্রথম দেশের শাসক হয়েও দেশের অর্থ প্রায় পুরোপুরি বিদেশে চালান করেছে। বিলেতের রাষ্ট্রশক্তি যদি প্রথম থেকে ভারতবর্ষকে শাসন করত, তাহলেও বোধ হয় শোষণের মাত্রা এতখানি বেড়ে যেত না। সওদাগর কোম্পানি মুনাফার লোভে এদেশে এসেছিল, লাভ লোকসান ছাড়া প্রজাদের সুখ দুঃখের কথা তারা প্রথমে বড় একটা ভাবেনি। কোম্পানির কর্মচারীরা দু'ভাবে দেশের অর্থসম্পদ লুটেছে। মুনাফা কম হলে কোম্পানি তাদের ক্ষমা করবে না বলে একদিকে তারা কোম্পানির মুনাফা বাড়াতে চেষ্টা করেছে, অন্যদিকে ব্যক্তিস্বার্থের তাগিদে নিজেদের পুঁজি বাড়াবার কথা কখনও ভোলেনি। তাদের ক্রিয়াকলাপে ভারতবর্ষের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হয়েছে। দেশের শিল্প উদ্যোগ ধ্বংস হয়েছে। জীবিকার অন্য কোন পথ না পেয়ে দলে দলে লোকে কৃষিকর্মে মন দিয়েছে। জমির উপর চাপ বৃদ্ধির ফলে দেশে দৈন্য ও অনটন দেখা দিয়েছে। ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও অভাবের ফলেই যে সিপাহীদের ধূম্রায়মান অসন্তোষ বিরাট বিক্ষোভে দেশকে আলোড়িত করেছিল, সে বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু তাই বলে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণ দিয়ে সিপাহী বিদ্রোহকে বুঝতে চাইলে ভুল হবে। দারিদ্র্য ও অনটন কেবল আওধ বা রোহিলাখণ্ডে দেখা দেয়নি—সমগ্র দেশেই দিনদিন অভাব অভিযোগ বেড়ে চলেছিল, কিন্তু তবু বোম্বাই, মাদ্রাজ বা বঙ্গদেশে ব্যাপক বিদ্রোহ হয়নি। এই একটি স্মরণ রাখলেই বোঝা যাবে যে অর্থনৈতিক ভিত্তিও বিদ্রোহের অন্য বহু কারণ ছিল।

ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে একদল এসব কারণের উপর ততটা জোর দেননি। তাঁরা অসন্তোষের এ সমস্ত উপাদানকে অস্বীকার করেননি বটে কিন্তু তাঁদের মতে প্রধানত রাজনৈতিক কারণেই ১৮৫৭ সালের বিপ্লব ঘটে। তাঁরা মনে করেন যে, সে সময়ে একদল রাষ্ট্রনায়কের মনে দেশের স্বাধীনতার আহ্বান প্রবল হয়ে ওঠে এবং তাঁরা তাই দেশের সমস্ত বিক্ষুব্ধ শক্তি একত্রিত করে ইংরেজ শাসন ধ্বংস ও স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রস্থাপনের পরিকল্পনা করেন। তাঁরা বলেন যে জাতিধর্মনির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীই যে বাহাদুর শাহকে বাদশাহ মেনে নিয়েছিলেন, সম্মিলিত রাষ্ট্রকল্পনা না হলে তা সম্ভব হবে কি করে? এ কথাও তাঁরা বলেন যে ধর্মভাবনার ফলেই যদি বিদ্রোহ ঘটত, তবে ইংরেজের স্বপক্ষ এবং বিপক্ষ উভয় দলেই হিন্দু মুসলমানের পরিচয় মিলবে কেন? কেবল অর্থনৈতিক কারণে বিদ্রোহ ঘটলে বাঙলা দেশ, মাদ্রাজ বা বোম্বাই অঞ্চলে বিপ্লব ঘটেনি কেন? একথা তো বলা চলে না যে এসব অঞ্চলেও শিল্প বাণিজ্যের ক্ষতি হয়নি, লোকের অভাব অনটন বাড়েনি। কাজেই তাঁদের মতে রাষ্ট্রভাবনার ভিত্তিতেই ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের সপ্রাত ব্যাখ্যা মিলবে।

এ সমস্ত মতের প্রত্যেকটিই যে আংশিকভাবে সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। লক্ষ মানুষের মন-প্রাণকে যে আন্দোলন নাড়া দেয়, কোন একটি বিশেষ লক্ষণ বা ঘটনার মধ্যে তার কারণ খুঁজতে গেলে ব্যর্থ হতে হবে। বস্তুতপক্ষে ১৮৫৭ সালে কেন ভারতবর্ষে এ বিপুল আলোড়ন এসেছিল, তার সহজ বা সরল কোন ব্যাখ্যা দেওয়া চলে না। ধর্মবোধ ও ধার্মিকতার মোহ, স্বদেশভক্তি, জাতিপ্রেম ও বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষ, অর্থনৈতিক দুঃখ-দৈন্য ও সামন্তবাদীর প্রভু-প্রীতির সঙ্গে ব্যক্তির আদর্শবোধ, ব্যক্তি স্বার্থের প্রেরণা এবং ব্যক্তিগত ক্ষোভ ও ক্রোধ এমনভাবে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল যে আজ তাদের বিভিন্ন প্রভাবকে স্বতন্ত্র করে দেখবার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

১৮৫৭ সালের আন্দোলনকে পুরোপুরিভাবে বুঝতে চাইলে অন্ধ মোহ ও কুসংস্কারকে বাদ দিলেও চলবে না। বহুদিন থেকে ভারতবর্ষে প্রচলিত ধারণা যে সাতান্ন সালের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। ১৫৫৬ সালে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে মোগল সাম্রাজ্য কায়েম হয়, ১৬৫৮ সালে আওরঙ্গজেব সিংহাসন দখল করেন, ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজ রাজত্বের পত্তন হয়। আকবরের জয় যে ৫৭ সালের এক বৎসর আগে এবং আওরঙ্গজেবের সিংহাসন লাভ এক বৎসর পরে, এ সমস্ত ছোট-খাট ব্যতিক্রম জনসাধারণের অন্ধ বিশ্বাসকে ব্যাহত করেনি। তাই ১৮৫৭ সালের বহুদিন আগে থেকেই জনমুখে প্রচারিত হয় যে পলাশীর যুদ্ধের পরে একশ বৎসর পূর্ণ হলেই ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসনের অবসান ঘটবে।

আজ একশ বছর পরে এ সমস্ত কথার বিচার করলে বহু বিভিন্ন তথ্য নিয়ে মতভেদের অবকাশ থাকলেও একটি কথা নিঃসন্দেহভাবে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। ১৮৫৭ সালের আন্দোলন সংঘবদ্ধ একত্রিত সর্বভারতীয় আন্দোলনের রূপ নিয়ে দানা বাঁধতে পারেনি। যাঁরা সে আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও চিন্তা, ভাবনা, কার্যক্রম ও লক্ষ্যের ঐক্যের কোন পরিচয় মেলে না। বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও দল বিভিন্ন কারণে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। বহু বিভিন্ন ঝর্ণা ও উপনদীর জলধারা মিলে মহানদীর প্রবাহের সৃষ্টি হয়—বহু ব্যক্তি ও দলের ব্যক্তিগত, দলগত, সম্প্রদায়গত, জাতিগত, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অসন্তোষের সম্মেলনে ১৮৫৭ সালে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তার ফলে এদেশে কোম্পানীর শাসন ধ্বংস হয়ে ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রকাশ্য শাসনের সূচনা হল। বিদ্রোহকে তাই অন্তত আংশিকভাবে সার্থক মানতেই হবে—কোম্পানীর মুনাফা-ভিত্তিক শাসনের বদলে ব্রিটিশ রাজশক্তির রাজনীতি-ভিত্তিক শাসনের বুনিয়াদ ১৮৫৭ সালেই পাকা হল। বিদ্রোহের প্রধান ও প্রকাশ্য লক্ষ্য—ভারতের স্বাধীনতা অর্জন—কিন্তু সেদিন সিদ্ধ হয়নি, তার জন্য দেশ ও জাতিকে আরো নব্বুই বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে।

২

১৮৫৭ সালে বিপ্লব কেন ঘটেছিল তার কারণ আলোচনা করা জাতীয় জীবনের জন্য জরুরী। ভারতবর্ষ কেন তার স্বাধীনতা হারাল এবং ১৮৫৭ সালের আন্দোলন কেন পুরোপুরি সফল হয়নি তার কারণ আলোচনা করা আরও বেশী জরুরী। কিছুকাল থেকে আমাদের জাতীয় জীবনের সমস্ত গলদের জন্যই ইংরাজকে দায়ী করা ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা বলে থাকি যে ইংরেজের শোষণের ফলে দেশের দারিদ্র্য দিন দিন বেড়ে

চলেছে। এদেশের জনসাধারণ অশিক্ষিত এবং ভারতবর্ষ অনগ্রসর দেশের মধ্যে অন্যতম, তার জন্যও আমরা ইংরাজকে দায়ী করেছি। এমন কি আমাদের চরিত্রের দুর্বলতা এবং নানাবিধ গলদের জন্য সমস্ত দোষ আমরা ইংরাজের ঘাড়ে চাপিয়েছি। বিদেশী শোষণের ফলে দেশে দারিদ্র্য বেড়েছিল, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হয়নি এবং জাতীয় চরিত্রে নানা দুর্বলতা আসে—একথা যেমন সত্য, জাতীয় চরিত্রে বড় গলদ না থাকলে বিদেশী শক্তি দেশ জয় করে পদানত করে রাখতে পারে না সে কথাও সমানভাবে সত্য। ভারতবাসীর চরিত্রে এবং মনোবলে দুর্বলতা না আসলে মুষ্টিমেয় বিদেশী এদেশ জয় করে এতদিন ধরে শোষণ করতে পারত না। দেশের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং নানাবিধ বিভাগের ফলে ইংরেজ এত সহজে ভারতবর্ষ দখল করতে পেরেছিল। ধর্ম ও ভাষার বিভেদ তো ছিলই, তা ছাড়া আঞ্চলিক বিভাগও কম ছিল না। কিছুদিন আগে পর্যন্ত বেশীরভাগ ভারতবাসী নিজেদের বাঙালী, মারাঠী, পাঞ্জাবী মনে করেছে—ভারতবর্ষের বাইরে গেলে কেবল তখনই নিজেদের ভারতবাসী মনে করত। ভারতবর্ষের ভাষাগুলিতে প্রদেশ বা অঞ্চলের কোন সঠিক প্রতি-শব্দ বা পরিভাষা মেলে না। বঙ্গদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, তামিলনাদ, উড়িষ্যা অথবা রাজস্থানকে চিরকাল দেশ বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। এসব অঞ্চলের অধিবাসীর প্রথম প্রীতি বঙ্গদেশ, কর্ণাটক অথবা গুজরাটকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, ভারত-ভক্তির পরিচয় সে পরিমাণে অনেক কম। ১৮৫৭ সালে নিশ্চয়ই এবং এখন অবধি হয়ত অধিকাংশ লোক নিজেকে বাঙালী, মারাঠী, পাঞ্জাবী বা তামিল ভেবে যতটা আনন্দ পায়, ভারতবাসী ভেবে ততটা আনন্দ পায় না।

ভাষা, ধর্ম ও প্রদেশের এ সমস্ত বিভেদের ফলে ভারতবর্ষ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। জাতীয়তাবোধের পক্ষে তার চেয়ে বেশী ক্ষতিকর হয়েছিল জাতিভেদ প্রথা ও সম্প্রদায়ভেদ। জাত-পাতের ঝগড়ায় জাতীয় ঐক্য শিথিল হয়েছে, অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় দাবীতে সমস্ত ভারতবাসী কায়মনবাক্যে এক হতে পারেনি। অতি প্রাচীন কালে হয়ত জাতিভেদ প্রথার খানিকটা সার্থকতা ছিল, *Indian Heritage* বইখানিতে আমি সে বিষয়ে আলোচনা করেছি। বর্তমান কালে কিন্তু জাতিভেদ প্রথার ফলে ভারতবর্ষের ক্ষতি ভিন্ন কোন লাভই হয়নি। তাতে কেবল যে হিন্দু সম্প্রদায়েরই লোকসান হয়েছে তা নয়, ভারতবর্ষের মুসলমান ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যেও ঐক্য ও সংহতি শিথিল হয়েছে। ১৮৫৭ সালে যখন ভারতবাসী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল, তখন একপক্ষে সুসংহত ও সুসংবদ্ধ ইংরেজ এবং অন্যপক্ষে শতধা বিভক্ত ভারতবাসীর বিশৃঙ্খল ও বিচ্ছিন্ন দল। তাদের সংঘাতের যে কি ফল হবে তা সহজেই বোঝা যায়। বিদ্রোহীদের মধ্যে একমাত্র ইংরেজ-বিদ্বেষ ভিন্ন আর কোন বিষয়েই ঐক্যের পরিচয় মেলেনি। ইংরেজ কেবলমাত্র সুসংবদ্ধই ছিল না, স্বদেশ ও তাদের মহারাণীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা তাদের মনে নূতন উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছে। সে সংঘর্ষে মুষ্টিমেয় ইংরেজ যে বহুসংখ্যক বিচ্ছিন্ন ভারতবাসীকে পরাজিত করবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

ইংরেজ এদেশ দখল করবার পরেও ভারতীয় রাজ-রাজড়া অথবা ভারতীয় জনসাধারণ একযোগে তাদের বাধা দিতে পারেনি। ফলে বিভিন্ন ভারতীয় রাজশক্তি একে একে পরাজিত হয়েছে এবং অন্য ভারতীয়ের সাহায্য নিয়েই সে পরাজয় সম্ভব হয়েছে। ভারতীয় সেনা-বাহিনী দিয়েই ইংরেজ ভারতবর্ষ জয় করেছে একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ১৮৫৭ সালেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ভারতীয় সিপাহীর সাহায্যেই ইংরেজ একে একে বিভিন্ন প্রতিরোধ

কেন্দ্র জয় করেছে। পাঞ্জাবের সমর্থন না পেলে দিল্লী দখল অনেক বেশী কঠিন হত। আওধ ও রোহিলাখণ্ডে জনবিদ্রোহ ব্যাপকভাবে ঘটেছিল কিন্তু সেখানেও ইংরেজ স্থানীয় সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়নি। মাদ্রাজ এবং বোম্বাইয়ের সৈন্যবাহিনী যে বিদ্রোহে যোগদান করে নি এবং ইংরেজকে সাহায্য করেছে সে কথা আগেই বলেছি।

বিদ্রোহীদের এবং তাদের নেতৃবৃন্দের বুদ্ধি ও বিচারে যে কতখানি অবনতি ঘটেছিল বিদ্রোহের ইতিহাস থেকেই তা স্পষ্ট। বিদ্রোহ সুরু হবার পরেও তারা সম্মিলিত ভাবে যুদ্ধ করতে পারেনি। যে সমস্ত সৈন্যদল বিদ্রোহ করেছিল তাদের মধ্যেও স্বার্থ চিন্তা ও পরস্পরের ব্যক্তিগত ঈর্ষার ফলে প্রতিরোধ শক্তি দানা বাঁধতে পারেনি। লখনৌ এবং কানপুরে সেনানায়কদের মতান্তর এবং মনান্তরের ফলে তারা পরাজিত হল। দিল্লীতে বিদ্রোহী নায়কেরা ইংরেজের বিরুদ্ধে যতখানি লড়েছে পরস্পরের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করেছে তার চেয়েও বেশী। ব্যক্তিস্বার্থ তাদের মধ্যে এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে সহযোগীকে অপদস্থ করবার জন্য দলের স্বার্থহানি করতেও তারা পরাঙ্মুখ হয়নি। দিল্লীতে বকত্ খাঁ যখন যুদ্ধ জয়ের চেষ্টা করছিলেন, তখন তাঁকে জব্দ করবার জন্য অন্যান্য সেনানায়কেরা যে কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিল, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গের সে রকম দৃষ্টান্ত বড় বেশী মেলে না। ১৮৫৭ এবং ১৮৫৮ সালের দুঃখময় সমস্ত কাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে ভারতবাসী একবারও সংহত ও সুশৃঙ্খলভাবে ইংরেজ রাজশক্তির মোকাবেলা করেনি।

এ ধরনের বিচ্ছেদ ও বিভাগের ফলে ভারতবাসীর সামরিক শক্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিচ্ছেদ ও বিভাগের ফলে দেশে ঐক্যবোধ গড়ে উঠতে পারেনি। মানুষ যখন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে তখন তাদের মধ্যে দলাদলি প্রবল হয়ে ওঠে। তার ফলে মানুষ নিজের ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের দোষ-ত্রুটিগুলিকেও গুণ বলে ভাবতে সুরু করে। ইতিহাসে বারবার দেখা গিয়েছে যে যে দলে যত কম লোক, সে দলে গোঁড়ামী তত বেশী। তা নইলে হয়ত দল হিসাবে তারা টিকে থাকতেই পারে না। ভারতবর্ষের লোক যখন ভাষা, সম্প্রদায় বা জাতের ভিত্তিতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল, তখন প্রত্যেক দল নিজের বিশেষ আচার বিশ্বাস ও ব্যবস্থাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ভাবতে সুরু করল।

ভারতবর্ষে সনাতন প্রথার প্রতি আকর্ষণ এমনিতেই প্রবল হয়ে উঠেছিল। ইতিহাসে দেখা যায় যে সমুদ্রপারের লোক দেশেবিদেশে যায় বলে তাদের মধ্যে সামাজিক গোঁড়ামী অপেক্ষাকৃত কম। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন আচার ও বিশ্বাসের সংগে পরিচয়ের ফলে তারা খানিকটা উদার মনোবৃত্তি লাভ করে। সে তুলনায় ডাঙার দেশের লোক নিজেদের রীতিনীতি ও আচার বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে থাকে বলে অপেক্ষাকৃত গোঁড়া হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে দেশেবিদেশে যাওয়ার যে রেওয়াজ ছিল, প্রায় তেরো চোদ্দশ বছর আগে তা শেষ হয়ে যায়। ফলে তেরো চোদ্দশ বছর ধরে দেশে জড়তা ও গোঁড়ামী বাড়তে থাকে। মুসলমান আমলে ইসলামের বিপ্লবী সংঘাতে একদিকে যেমন অনেক কুসংস্কার ও কদাচার ভেঙ্গে পড়েছে, অন্যদিকে তার প্রতিক্রিয়ায় সমাজের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস ও গোঁড়ামী আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ইংরেজ যখন এদেশে এলো তখন ভারতবর্ষ তার মননশীলতা ও নতুনকে গ্রহণ করবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। পুরাতনের প্রতি অহেতুক শ্রদ্ধার ফলে নতুন ভাবনা ও নতুন শক্তিকে গ্রহণ করবার স্পৃহা কমে গিয়েছে। ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের পক্ষেই একথা সমান সত্য। নতুন চিন্তাধারা ও নব নব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় সেদিনের ভারতবর্ষে মেলে না। তাই বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার নিয়ে ইংরেজ যখন এদেশে উপস্থিত

হল ভারতবাসী তাদের প্রতিরোধ করতে পারেনি।

যা জীবন্ত তা নিরন্তর বদলায়। নতুনকে গ্রহণ ও আত্মসাৎ করবার শক্তি লোপেরই অন্য নাম মৃত্যু। ভারতবর্ষে বহু শতাব্দী ধরে চিত্তের জড়তা বাড়ছিল বলেই ভারতবাসী পদে পদে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। চিত্তের জড়তার ফলেই গোঁড়ামী ও কুসংস্কার বেড়ে যায়। তার ফলে মানুষ একদিকে নতুন চিন্তাধারা দেখে ভয় পায়, অন্যদিকে পুরানো আচার ও সংস্কার আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। এককালে যে সব বিশ্বাস বা রীতিনীতি সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর ছিল, কালপ্রবাহে সেগুলি অনুপযোগী হয়ে পড়লেও তখন আর তাদের পরিবর্তন বা পরিবর্জন করতে চায় না। ভারতবর্ষের সমাজ স্থিতিশীল ও জড় হয়ে পড়বার ফলে আঠারো ও উনিশ শতকে বারবার ভারতবাসীর পরাজয় হয়েছে। ইতিহাসে আমরা দেখি যে বিরাট ভারতীয় সৈন্যবাহিনী মুষ্টিমেয় বিদেশী সৈন্যের হাতে বহুবার পরাজিত হয়েছে। সে পরাজয়ের কারণ সাহসের অভাব নয়, কারণ ভারতবাসী ভীরু বা দুর্বল নয়। বিদেশী ঐতিহাসিকও স্বীকার করেছেন যে বহুক্ষেত্রে ভারতীয় সৈন্য শুধু সাহসের নয় দুঃসাহসেরও পরিচয় দিয়েছে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনটি কারণে ভারতীয় সৈন্য সমর ক্ষেত্রে অনন্য সাহস দেখিয়েও জয়লাভের গৌরব অর্জন করতে পারেনি। নিকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার, রণ-কৌশলে দুর্বলতা এবং সংহতির অভাব, এই তিনটি প্রধান কারণেই বারবার বিরাট ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সংখ্যাল্প বিদেশীর হাতে পরাজিত হয়েছে। মানসিক জড়তা ও গোঁড়ামীর জন্যই ভারতীয় মানসে এই তিন ক্ষেত্রে নিকৃষ্টতা দেখা দিয়েছে। যা পুরাতন তাই বরণীয়, এই বিশ্বাসের ফলেই ভারতবর্ষে নতুন অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কারের চেষ্টা হয়নি, বরং বিদেশে উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রের প্রচলন হওয়ার পরেও ভারতবাসী সহজে তা গ্রহণ করেনি। বন্দুক কামানের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈনিক ঢাল তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছে। প্রাচীনপন্থী মনোবৃত্তির ফলে রণকৌশলের উৎকর্ষও ব্যাহত হয়েছে। বারবার পরাজিত হয়েও ভারতীয় সেনাপতি সনাতন সমরনীতি বদলাতে চায়নি। প্রাচীনের প্রতি অহেতুক আকর্ষণ শৃঙ্খলাহীনতারও অন্যতম কারণ। যারা আচারকে বুদ্ধি ও বিচারের উপরে স্থান দেয়, তারা হয় অন্ধভাবে চিরাচরিত প্রথার অনুসরণ করে, অথবা ঘটনার বিপর্যয়ে তাকে পুরোপুরি বর্জন করে। গুরুবাদী মনোভাব যদি একবার ভেঙে যায়, তখন তার বদলে নাস্তিক মনোবৃত্তির প্রকাশ ইতিহাসে বারবার ঘটেছে। ভারতবর্ষের সামরিক ইতিহাসে দেখা গিয়েছে যে রাজা বা সেনাপতি বন্দী বা নিহত হলে সমস্ত সৈন্যদল হতাশ ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। অন্য বহুদেশে দেখা যায় যে, অধিনায়কের মৃত্যুতে সৈন্যবাহিনী মরিয়া হয়ে লড়াই করে নিশ্চিত পরাজয়কে বিজয়ে রূপান্তরিত করেছে।

গোঁড়ামীর অর্থই সংকীর্ণতা এবং যেখানে চিত্ত সংকীর্ণ, সেখানে বিজ্ঞানের বিকাশ হতে পারে না। সন্দেহ, জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান বিজ্ঞানের মূল মন্ত্র। জীবনের যে কোন ক্ষেত্রেই প্রশ্ন করবার প্রবৃত্তিকে যদি একবার বাধা দেওয়া যায়, তবে তার ফলে অনুসন্ধিৎসা ও বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির হানি হতে বাধ্য। প্রাচীন ভারতের দার্শনিকরা জীবনের চরম সত্য সম্বন্ধেও প্রশ্ন করতে দ্বিধা করেন নি—ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ ও প্রশ্নের পরিচয়ও সে যুগের দর্শনে মেলে। শিষ্য নিরঙ্কুশ ও ব্যাপক প্রশ্নে গুরুকে বিব্রত করছে তারও দৃষ্টান্ত সে যুগে মেলে। মধ্য যুগের প্রারম্ভেই কিন্তু ভারতবর্ষে এ নির্ভীক মানসিকতা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে ইসলামের আবির্ভাবের পরেও নির্ভীক

জিজ্ঞাসা ও সন্দেহবাদ পুনর্জীবিত হল না। ইসলাম প্রথমে বিরাট মানসিক বিদ্রোহ হিসেবেই প্রকাশিত হয়েছিল এবং প্রত্যাদেশ ও প্রভুত্ববাদের বদলে বিচার-বুদ্ধি ও যুক্তির ভিত্তিতে মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে চেষ্টা করেছিল। ভারতবর্ষে পৌঁছাবার আগেই কিন্তু ইসলামের এ বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এদেশে মুসলমান মুক্ত বিচার-বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা করেনি বরং হিন্দু সমাজের সনাতনী মনোবৃত্তি ও অন্ধ আচার-নিষ্ঠার পাশে মুসলমান সমাজের এক নতুন আচার-নিষ্ঠার প্রতিষ্ঠা করেছিল।

অনুসন্ধিৎসা ও জিজ্ঞাসার প্রসারেই বুদ্ধির বিকাশ হয়। ভারতবাসী যেদিন প্রশ্ন করতে ভুলে গেল, কর্তৃত্বকে অপ্রশ্নভাবে মেনে নিতে সুরু করল সেদিন থেকে ভারতীয় বিচারবুদ্ধিরও অবনতি সুরু হল এবং ভারতবাসীর মানসিক, নৈতিক ও আত্মিক প্রগতি অবরুদ্ধ হয়ে এল। মননশীলতা কমে গেলে নৈতিক বলও কমে যায়। যাঁরা সত্যসন্ধানী, তাঁরা নির্ভীক এবং নির্বিকার চিত্ত, তাই কোন অন্য বিবেচনায় তাঁদের বিবেক বা বিচারবুদ্ধি পথভ্রষ্ট হয় না। কোন এক ক্ষেত্রে সাংসারিক বা পারলৌকিক সুবিধা বা লোভের মোহে সত্যসন্ধানকে সীমাবদ্ধ করলে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই সাংসারিক বুদ্ধি নীতিবোধের চেয়ে প্রবল হয়ে ওঠে। ব্যক্তি-স্বার্থের জন্য জাতীয় কল্যাণ বিসর্জন দেওয়া তখন আর অন্যায় মনে হয় না। ১৮৫৭ সালের ইতিহাসে আমরা বারবার দেখি যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও স্বকীয় স্বার্থের জন্য দেশের স্বাধীনতার দাবী ও ধর্মের আহ্বানকে বিনা দ্বিধায় অস্বীকার করেছেন।

অন্তর্দ্বন্দ্ব এত প্রবল না হলে ভারতীয় অভ্যুত্থান হয়তো এত সহজে পরাজিত হত না। মুক্ত বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির অভাবে যে গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতা সমাজ মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, তার প্রভাবে সে পরাজয় আরো ব্যাপক হয়ে উঠেছিল। এ সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও ভারতবাসীর জয়ের যেটুকু সম্ভাবনা ছিল, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা তাও নষ্ট করে দিল। ব্রাহ্মণ যেখানে শূদ্রকে মানুষের অধিকার দেয়নি, মুসলমান যেখানে হিন্দুকে এবং হিন্দু মুসলমানকে কেবল ধর্ম বা জাতিভেদের ভিত্তিতে অনাত্মীয় করে রেখেছে, সেখানে সমাজে সংহতি আসবে কি করে? ভারতীয় সমাজ শতধাবিচ্ছিন্ন বলেই সুসংবদ্ধ সংখ্যাল্প ইংরেজের আঘাতে ভারতীয় প্রতিরোধ ভেঙে পড়ল। মানুষের মধ্যে এ বৈষম্যবোধ, মানুষে মানুষে এত পার্থক্য ও অসাম্য বোধ হয় ভারতবর্ষের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় কলঙ্ক ও দুর্বলতা। বস্তুতপক্ষে ১৯৫০ সালে স্বাধীন ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করবার পূর্বে কোনদিনই এদেশে সকল মানুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়নি। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ নরশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার পেয়েছে, শূদ্র এবং পঞ্চমার সেদিন সমাজে কোন স্থানই ছিল না। বেদান্ত ঘোষণা করেছে যে সমস্ত মানুষের মধ্যেই ব্রহ্মের প্রকাশ, কিন্তু সে ঘোষণা কেবলমাত্র মুখের কথাই রয়ে গেল, কার্যত ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণেতর সমস্ত মানুষেই নানারকম গ্লানি বা অপমান সহ্য করেছে।

মানবত্বের এ অনাদর ভারতবর্ষের লোকের এত মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল যে ইসলামের মতন বিপ্লবী গণতন্ত্রও এদেশে পুরোপুরি কার্যকরী হয়নি। জাতিভেদের কতকগুলি বড় গলদ অবশ্য ইসলাম শুধরিয়েছে, কিন্তু ইসলামের প্রভাবেও ভারতবর্ষে সমস্ত মানুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়নি। মুসলমান যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার উপভোগ করেছে, অমুসলমানকে সে সমস্ত অধিকার সমপরিমাণে দেওয়া হয়নি। মুসলমানদের মধ্যেও অধিকারের তারতম্যের পরিচয় মেলে, এমন কি কালক্রমে সৈয়দ, পাঠান, মোগল, শেখের যে সম্বন্ধ, তা হিন্দুর চতুর্বর্ণের সম্বন্ধে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রাজ-

শক্তি যখন পাঠানের হাতে, তখন পাঠান মুসলমান যে ভাবে প্রভুত্ব করেছে, মোগল রাজত্বের যুগে মোগল মুসলমানও ঠিক তাই করেছে। শুধু তাই নয়, ভারতজাত মুসলমান এবং বিদেশাগত মুসলমানের যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, তা এত প্রবল হয়ে না উঠলে বোধ হয় মোগল সাম্রাজ্য এত সহজে ভেঙে পড়ত না। শিয়াসুন্নীর ঝগড়ার কথাও কে না জানে? আওরঙ্গজেব যদি দাক্ষিণাত্যের শিয়া রাজ্যগুলির ওপরে এত খড়্গহস্ত না হতেন, তবে হয়তো মারাঠাশক্তির বিকাশ এত সুগম হত না।

ইংরেজ রাজত্বেও ভারতবর্ষে সকল মানুষের সমানাধিকার স্বীকৃত হয়নি। ইংরেজ বলেছে যে আইনের চোখে সমস্ত মানুষ সমান, কিন্তু কাজের বেলায় ইংরেজ মহা-ব্রাহ্মণের মতন আচরণ অবলম্বন করেছে। বস্তুতপক্ষে ইংরেজের আগমনের ফলে এদেশের ছত্রিশ জাতের মাথার উপরে এক নতুন মহাপ্রভু জাতের পত্তন হল, একথা বলা অন্যায় হবে না। কেবল রাজশক্তির অহঙ্কার নয়, জাতির দম্ভ এবং বর্ণের শ্রেষ্ঠত্বও ইংরেজ যে ভাবে দাবী করেছে তারই ফলে ইংরেজ কোনদিন ভারতীয় জনসাধারণের চিত্ত জয় করতে পারেনি। নিরপেক্ষ বিচারে এ কথা মানতেই হবে যে বহুভাবে ইংরেজ ভারতবর্ষের উপকার করেছে। শান্তি স্থাপন, রাস্তাঘাট তৈরী বা নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সুখ-সুবিধার কথা বাদ দিলেও ইংরেজের চিন্তাশক্তি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সংস্পর্শে ভারতবর্ষে যে নব জাগরণ এসেছিল, ইংরেজের রাজনৈতিক আদর্শ ও স্বাধীনতা স্পৃহার প্রভাবে এ দেশে যে নতুন জাতীয়তা-বোধের পত্তন হয়েছিল, শুধু সেই কারণেই ভারতবাসী চিরদিন ইংরাজের কাছে ঋণী থাকবে। সর্বভারতীয় যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আজ ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছে, তার পরিকল্পনাও আমরা বহুল পরিমাণে ইংরেজের কাছ থেকে গ্রহণ করেছি। এ সমস্ত ঋণ স্বীকার করেও কিন্তু বলতে হয় যে ইংরাজকে আমরা কোনদিনই মনে প্রাণে গ্রহণ করিনি। মানুষের সমানাধিকারকে ইংরেজ স্বীকার করেনি বলেই ইংরেজের প্রতি আমাদের এ বিতৃষ্ণা।

১৮৫৭ সালের আন্দোলন আপাতদৃষ্টিতে সার্থক হয়নি, কিন্তু যে বীজ সেদিন রোপিত হয়েছিল, ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভে তা সার্থক হয়েছে। ১৮৫৭ সালের লাভ ও লোকসান দুইয়েরই আজ যদি হিসাব করি তবে বলতে হয় যে লাভের দিকে স্বাধীনতালাভের স্পৃহা এবং ক্ষতির দিকে সেদিনের পরাজয়ের গ্লানি। কিন্তু কেন ভারতবর্ষ সেদিন পরাজিত হয়েছিল তার বিশদ বিশ্লেষণ করে আমরা যদি ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারিত করি তবে সেদিনের ক্ষতিও পরিশেষে লাভের কোঠায় গোণা যাবে। ১৮৫৭ সালের পরাজয় আমাদের শিখিয়েছে যে ক্ষুদ্রতর স্বার্থের মোহে বৃহত্তর স্বার্থকে বিসর্জন দিলে সর্বনাশ এড়ানো যায় না। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পারস্পরিক ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করে দেশের এবং মানুষের কল্যাণের সাধনায় ব্যক্তিরও কল্যাণ হয়। ১৮৫৭ সালের ঘটনায় আমাদের এ কথাও শিখিয়েছে যে গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতার পথ মৃত্যুর পথ। যে যুগে ভারতবর্ষ মুক্ত চিত্তে নতুনকে গ্রহণ করেছে, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে নিজের অন্তরের যোগ অব্যাহত রেখেছে, যে যুগে বস্তু ও চিন্তাজগতে ভারতবাসী নতুন নতুন কীর্তি স্থাপন করেছে। বাইরের দরজা যেদিন বন্ধ হল, সেদিন চিন্তার শক্তি ও তেজ লুপ্ত হতে সুরু করল। বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও বিচার-বুদ্ধি ছাড়া ভারতবর্ষের কেন কোন দেশেরই মুক্তি নেই। ১৮৫৭ সালে এ কথা সত্য ছিল—বর্তমানের পৃথিবীতে সে কথা দিনদিন আরো বেশী সত্য হয়ে দেখা দিচ্ছে। পৃথিবীতে আজ স্থান-কালের দূরত্ব লোপ পেতে বসেছে, সমস্ত মানুষ পরস্পরের আত্মীয় প্রতিবেশী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ছুৎমার্গ, সংকীর্ণতা বা কুসংস্কারের স্থান বর্তমানের পৃথিবীতে

নেই। জাতিধর্মভাষানির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকারের ভিত্তিতে স্বাধীন বুদ্ধি ও মুক্ত বিচারের দৃষ্টিভঙ্গীতে আজ যদি স্বাধীন ভারতবর্ষ মানব কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে, তবে ১৮৫৭ সালের কোনদিনই পুনরাবৃত্তি হবে না, হতে পারে না।

কানপুরের কথা

সুরেন্দ্রনাথ সেন

সিপাহী যুদ্ধের সময় উত্তর ভারতের নানা স্থানে বহু হত্যাকাণ্ড হইয়াছিল। কিন্তু জুন ও জুলাই মাসে কানপুরের সতীচৌরা ঘাটে ও বিবিঘরে নরনারী শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড হয়, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসে তাহার তুলনা বিরল। উভয় পক্ষই মীরাটে, বেনারসে, এলাহাবাদে ও লক্ষ্ণৌতে অমানুষিক নৃশংসতার পরিচয় দিয়াছে। ইংরাজের হাতেও অকারণে বহু নিরপরাধ শিশু বৃদ্ধ নরনারী নিহত হইয়াছে। কিন্তু কানপুরের বিশেষত্ব প্রতিশ্রুতিভঙ্গ। জীবনরক্ষার আশ্বাস পাইয়া সেনানিবাসে অবরুদ্ধ ইংরাজ ও ইউরেশিয়ানের দল সতীচৌরা ঘাটে এলাহাবাদে যাইবার অভিপ্রায়ে নৌকারোহণ করিয়াছিল। তারপর তীরে লুক্কায়িত কামান হইতে তাহাদের নৌকার উপর গোলাবৃষ্টি করা হয়। যাহারা নদীগর্ভে রক্ষা পাইয়াছিল তাহাদিগকে বন্দী করিয়া আনা হয়। বন্দীদিগের মধ্যে পুরুষদিগকে তখনই গুলি করিয়া মারা হয়। নারী ও শিশুদিগকে হত্যা করা হয় জুলাই মাসে, সেনাপতি হ্যাভলক কানপুর অধিকার করিবার প্রাক্কালে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের যে সমস্ত বিবরণ বাহির হইয়াছে তাহার অধিকাংশই অতিরঞ্জন-পুষ্ট। ইংরাজ লেখকেরা কানপুরের কোতলের জন্য সাধারণতঃ নানা সাহেবকে দায়ী করিয়া থাকেন। তাহার প্রতি সমসাময়িক ইংরাজদিগের বিদ্বেষ এত তীব্র যে ব্যাকরণের নিয়মের অন্যথা করিয়া তাহাকে The Nana বলা হইয়াছে। তারপর একশত বৎসর অতীত হইয়াছে। এখন নানার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণ ধীরভাবে বিচার করিবার সময় আসিয়াছে।

কানপুরের ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর সংখ্যা খুব বেশী নয়। যাহারা সেনাপতি হুইলারের সঙ্গে কানপুরের সেনানিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সতীচৌরা ঘাটের আক্রমণে তাঁহারা সকলে নিহত হন নাই। ইংরাজদিগের মধ্যে রক্ষা পাইয়াছিলেন দুইজন সামরিক কর্মচারী ও দুইজন সাধারণ সৈনিক। ইউরেশিয়ানেরা রক্ষা পাইয়াছিলেন বেশী সংখ্যায়। তাহাদের ছদ্মবেশ ধারণের সুবিধা বেশী ছিল, দেশের লোকের আশ্রয়ও তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পাইয়াছিলেন, সুতরাং যেখানে চারিজন ইংরাজ অতিকষ্টে পলায়ন করিতে পারিয়াছিলেন সেখানে যে অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে দেশের আচার ব্যবহার ও ভাষার সহিত পরিচিত ইউরেশিয়ানদের মধ্যে ২০।২১ জন রক্ষা পাইয়াছিলেন ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। ইংরাজদিগের মধ্যে লেঃ ডিলাফস ও লেঃ টমসন কানপুরের অবরোধ ও সতীচৌরা ঘাটের হত্যাকাণ্ডের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। ডিলাফসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমসাময়িক সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছিল, পরে *Annals of the Indian Rebellion* নামক সঙ্কলনগ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়। টমসনের বিবরণ তথ্যবহুল। তিনি বিদ্রোহের আরম্ভ হইতে সতীচৌরা ঘাটের নৌকাযাত্রা ও পরবর্তী আক্রমণ ও যুদ্ধের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়াছেন। যুদ্ধ এইজন্য বলিতেছি যে ইংরাজেরা নিরস্ত্র ছিলেন না। সন্ধির সর্ত অনুসারে তাহারা অস্ত্রশস্ত্র লইয়াই শিবির হইতে রওনা হইয়াছিলেন।

ইউরেশিয়ানদিগের মধ্যেও একজন প্রত্যক্ষদর্শী কানপুরের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম সেপার্ড। বিদ্রোহের চারি বৎসর পূর্ব হইতেই তিনি কার্যোপলক্ষে সপরিবারে

কানপুরে বাস করিতেছিলেন। সেখানে তিনি কমিসেরিয়েটে হেড এসিস্ট্যাণ্টের কাজ করিতেন। সেবার তিনি পারিবারিক প্রয়োজনে কলিকাতা গিয়াছিলেন। সেখানে থাকিতে তিনি সিপাহীদিগের মধ্যে অসন্তোষ বা চাঞ্চল্যের কোন খবর পান নাই। ফতেপুরে পৌঁছিয়া তিনি মীরাট ও দিল্লীর বিদ্রোহের সংবাদ শুনিলেন। কিন্তু তখন আর ফিরিয়া যাইবার উপায় ছিল না। কানপুরে আসিয়া আর দশজনের মত সেপার্ড'ও উদ্বেগে দিন কাটাইতে লাগিলেন। আর দশজনের মত তিনিও আত্মরক্ষার জন্য চৌকিদারের সংখ্যা বাড়াইয়া দিলেন। সেনাপতি হুইলার সিপাহী লাইনের সঠিক খবর পাইবার জন্য কয়েকজন গুপ্তচর নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহাদের একজনের সঙ্গে সেপার্ডের হৃদ্যতা ছিল। সুতরাং তাহার মারফত তিনি প্রত্যেক দিন সহরের ও সেনানিবাসের খবর পাইতেন। শেষে তিনিও আর সকলের মত সপরিবারে হুইলারের নির্বাচিত আশ্রয় স্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে দেশী লোকের ছদ্মবেশে আত্মীয়-স্বজনের সহিত সহরের অন্য বাড়ীতে আত্মগোপন করিবেন, এইজন্য একটি বাড়ীও ভাড়া করা হইয়াছিল। কিন্তু সেপার্ড পত্নী ইংরাজ কন্যা। দেশীয় নারীর পরিচ্ছদ পরিধান করিলেও তাহার দেহের বর্ণ গোপন করিবার উপায় ছিল না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত তাহাদিগকে সহরে থাকিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। অবরোধের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া ২৪শে জুন তারিখে সেপার্ড ছদ্মবেশে ইংরাজ শিবির পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্যক্রমে তিনি অনতি-বিলম্বে সিপাহীদিগের হাতে বন্দী হন। সুতরাং সতীচৌরা ঘাটের আক্রমণের দিন তাহার কোন অনিষ্ট হয় নাই। অবশেষে সেনাপতি হ্যাভলক যখন কানপুর পুনরাধিকার করেন তখন অন্য কয়েকজন বন্দীর সহিত সেপার্ড'ও মুক্তিলাভ করেন। তাঁহার পত্নী ও সন্তানেরা সতীচৌরা ঘাটের হাঙ্গামায় নিহত হইয়াছিলেন।

১৮৫৭ সালেই তিনি কানপুরে সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ, ইংরাজ শিবির অবরোধের কাহিনী ও তাহার বন্দীদশার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। এই বিবরণ কলিকাতার কতকগুলি সংবাদ পত্রে ও লণ্ডনের *Evening Mail*-এ বাহির হইয়াছিল। পরে এই বিবরণই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া *Narrative of the Munity at Cawnpore* নামে পুস্তকাকারে ১৮৬৩ সালে আগ্রা হইতে প্রকাশিত হয়। সেপার্ডের পুস্তকের একাধিক সংস্করণ হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্তকের নূতন নাম দেওয়া হয় *A Personal Narrative of the outbreak and Massacre at Cawnpore during the Sepoy Revolt of 1857.* পুস্তকের নাম পরিবর্তনে বিশেষ কিছু যায় আসে না। কিন্তু বিষয়বস্তুতে অদলবদল হইলে তাহা সর্বদা উপেক্ষা করা যায় না। সেপার্ডের গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা পরিমাণে অল্প হইলেও লক্ষ্য করিবার যোগ্য।

বিদ্রোহ দমনের পরে কানপুর সম্বন্ধে সরকারীভাবে তদন্ত হইয়াছিল। এই সময় যাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে নানকচাঁদ মহাজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ব্যক্তি ইতিপূর্বেই সরকারী কর্মচারীদের নিকট এক সুদীর্ঘ রোজ-নামচা পেশ করিয়াছিল। এই রোজ-নামচায় যেরূপ তারিখ ও ঘটনার অনৈক্য দেখা যায় তাহাতে নানকচাঁদের সাক্ষ্যে আদৌ আস্থা স্থাপন করা যায় না। কিন্তু ইংরাজ ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ন ও হোমস্ নানকচাঁদের রোজনামচা নির্ভরযোগ্য সমসাময়িক বিবরণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। নানকচাঁদের সাক্ষ্য অনুসারে বিদ্রোহের পূর্ব হইতেই সিপাহীদিগের সহিত নানা সাহেবের

গুপ্ত ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছিল। সেপার্ড মধ্যে মধ্যে সিপাহীদিগের সঙ্গে বিদ্রোহের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করিতেন। হুইলারের নিয়োজিত গুপ্তচরদিগের সংগৃহীত সংবাদও তিনি নিয়মিতভাবে পাইয়া থাকিতেন। তাঁহার গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ১১ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন—

It was now clearly understood from the reports received from time to time from the informers employed by General Wheeler, that the native troops, whenever they might make up their mind to break out—had no intention to attack the English, or molest the Christian Community of Cawnpore. It was their intention to proceed at once to Delhi, after possessing themselves of all the government money in the treasury; which they intended as a present to their new King, but they would return immediately after—with a strong reinforcement, headed by one of the Princes or Generals of the Padshaw, and in his name take possession of the station of Cawnpore.

নানা সাহেবের সহিত যদি সিপাহীদিগের পূর্বাহ্নেই একটা বোঝাপড়া হইয়া থাকিত তবে দিল্লী গিয়া সেখান হইতে কোন শাহজাদা বা সিপাহসালারকে লইয়া আসিবার প্রশ্ন ওঠে না। বিদ্রোহ আরম্ভ হইবা মাত্রই নানা সাহেব বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারিতেন। অবশ্য শোনা কথা প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয় না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে পরবর্তী সংস্করণে সেপার্ড সিপাহীদিগের এই অভিপ্রায়ের কথা একেবারেই বাদ দিয়াছেন। সরকারী টাকা লুট করিয়া দিল্লী যাইয়া বাদশাহকে উপঢৌকন দিবার সঙ্কল্পের কথাটুকু মাত্র পরবর্তী সংস্করণে পাওয়া যায়। ইহার কারণ অনুমান করা কঠিন। পরবর্তী সংস্করণে পরে শোনা অনেক কথা থাকিতে পারে কিন্তু আগে শোনা কোন কথা পরিত্যক্ত হওয়া স্বাভাবিক নয়, বিশেষতঃ যখন শোনা কথা হিসাবেই তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রথম সংস্করণে সেপার্ড নানা সাহেবকে সতীচৌরা ঘাটের হত্যার অপরাধ হইতেও অব্যাহতি দিয়াছেন। তিনি সতীচৌরা ঘাটের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন নাই। দেশীয় লোকদের মুখে এই হত্যাকাণ্ডের বিবরণ শুনিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি পরবর্তী সংস্করণে কোন পরিবর্তন করেন নাই। সুতরাং ঘটনার সময় তিনি যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা বিবেচনার যোগ্য সন্দেহ নাই। সেপার্ড লিখিয়াছেন—

All native accounts agree in stating that the Nana did not go to witness the slaughter on the banks of the river. He is said to have remained in his tent all the while, and even to have expressed compunctions of conscience at the treachery that was about to be enacted, saying that he had taken a most solemn oath to allow the English to leave in safety, and therefore would not accord his consent to their slaughter, but his younger brother "Bala Sahib" a greater villain than the Nana, backed by Azimoollah Khan and the Mahomedans of the 2nd Cavalry, overruled his decision, and took

it upon themselves to conduct the foul deed saying, that they had taken no solemn oath, or bound themselves by any promises, and therefore were perfectly at liberty to do as they liked. They accordingly arranged everything as has been related and by their influence and example caused the whole of the troops both Hindoos and Mahomedans to join in the treacherous act. (প্রথম সংস্করণ ৯৮ পৃষ্ঠা, ১৮৭৯ সালের লক্ষ্ণৌ সংস্করণ ৮২ পৃষ্ঠা)। বলা বাহুল্য দ্বিতীয় সংস্করণে সতীচৌরা ঘাটের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা উইলিয়মসের রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত, প্রথম সংস্করণে তাহা নাই।

ফতেগড় হইতে আগত ইংরাজ পলাতকগণ ১১ই জুন কানপুরের নিকট ধৃত হন। প্রথম সংস্করণে সেপার্ড বলিয়াছেন যে, নানার ইচ্ছা ছিল ইহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখা হয় কিন্তু সিপাহীদিগের ও তাহাদের সেনাপতি টীকা সিংএর আপত্তিতে তাহার অভিপ্রায় ব্যর্থ হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গের তিনি আদৌ বালা সাহেবের নাম করেন নাই—

"In this manner they were brought to *Savada* to the Nana's camp, who directed them to be kept as prisoners, but the troops of the 2nd Cavalry and their General Teeka Singh would not consent. The latter made known in plain terms to the Nana, that if he did not direct their slaughter, he would take it upon himself to give the order" (৪৯ পৃষ্ঠা) পরবর্তী সংস্করণে আছে but the troopers of 2nd Cavalry and their General Teeka Singh, *instigated by Nana's brother Bala*, would not consent (১৮ পৃষ্ঠা)। অধিকন্তু এই সংস্করণে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে সাবালা কুঠীর পশ্চিমের খোলা জায়গায় বালার হুকুমেই ফতেগড়ের বন্দীদিগকে গুলি করা হয়। (৩৯ পৃষ্ঠা)

ঘটনার বাইশ বৎসরের মধ্যে একই লেখকের বিবরণে যদি এত পার্থক্য দেখা যায় তবে সতীচৌরা ঘাট ও বিবিঘরের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রমাণ যে বিশেষ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করা প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুল্য। ১৮৫৯ সালের একখানি ইস্তাহারে নানা সাহেব বলিয়াছেন যে তিনি ইংরাজ বন্দী ও বন্দিনীদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহারা নিহত হইয়াছে তাহাদের নিজেদের সিপাহীদিগের হাতে। সেপার্ডের বিবরণ এই কথার পোষকতাই করে। কিন্তু বালা বলিয়াছেন যে তাহার কোন ক্ষমতাই ছিল না, প্রকৃতপক্ষে তিনি তাহার ভ্রাতার একান্ত আয়ত্তাধীনে ছিলেন। সেপার্ডের বিবরণ বিশ্বাস করিলে এই কথা গ্রহণ করা যায় না।

কবিতা

গরিবের মৃত্যু

শার্ল বোদলেয়ার

মৃত্যুই, হায়, সান্ত্বনা! সে-ই বাঁচিয়ে রাখে;
আয়ুর লক্ষ্য, সে ছাড়া ভরসা নেই কিছুই;
সেই কড়া মদ, ভরপুর যার নেশার ঝোঁকে
বুক বেঁধে চলি, যাবৎ সাঁঝের ছায়া না ছুঁই।

পুঁথির পাতায় নামজাদা সেই সরাইখানা—
কালো দিগন্তে কাঁপে আমাদের আলোর ফোঁটা—
পেট পুরে খেয়ে ঘুম দিতে নেই যেথায় মানা,
হিম, শিলা, ঝড় পেরিয়ে কেবলি সেদিকে ছোটা।

সে-ই দেবদূত, যার হাত মায়ামন্ত্র জানে,
ঘন ঘুম আর স্বর্গসুখের স্বপ্ন আনে,
নাগা ভিক্ষুকে শেজ পেতে দেয় চমৎকার;

গোলা-ভরা ধান, ভগবান যার রাখেন চাবি,
গরিবের থলি, বাস্তুভিটায় আদিম দাবি,
না-জানা আকাশে এগিয়ে দেয় যে সিংহদ্বার।

প্রেমিক-প্রেমিকার মৃত্যু

শার্ল বোদলেয়ার

কবরের মতো গভীর ডিভানে লুটিয়ে
মৃদু বাসে ভরা র'বে আমাদের শয্যা
সুন্দরতর দূর আকাশেরে ফুটিয়ে
দেয়ালের তাকে অদ্ভুত ফুলসজ্জা।

যুগল হৃদয়, চরম দহনে গলিত,
বিশাল যুগল-মশালের উল্লাসে
হবে মুখোমুখি-দর্পণে প্রতিফলিত
যুগ্ম প্রাণের ভাস্বর উদ্ভাসে।

গোলাপি এবং মায়াবী নীলের সৃষ্টি
এক সন্ধ্যায় মিলবে দুয়ের দৃষ্টি
যেন বিদায়ের দীর্ণ দীর্ঘশ্বাস;

পরে, দ্বার খুলে, মলিন মুকুরে রাঙাবে
এক দেবদূত, সুখী ও সবিশ্বাস;
আমাদের মৃত আগুনের ঘুম ভাঙাবে।

শিল্পীদের মৃত্যু

শার্ল বোদলেয়ার

ওরে ম্লান ব্যঙ্গচিত্র, কত আর ঘণ্টা নেড়ে-নেড়ে
চুমো দেবো আনত ললাটে তোর? আর কত বার
রহস্যের লক্ষ্যবেধে ব্যর্থ হ'য়ে, তূণীর আমার,
তোকে রিক্ত ক'রে দেবো প্রকৃতিকে তীর ছুঁড়ে-ছুঁড়ে?

কুটিল সংকল্পে মেতে আমাদের আত্মা যাবে ছিঁড়ে,
ফেলে দিতে হবে ঢের ভারা-বাঁধা নির্মাণের ভার—
তবে যদি দেখা মেলে, যে-গোপন মহান সত্তার
নারকী তৃষ্ণার জ্বালা আমাদের কান্না নেয় কেড়ে।

কেউ-কেউ হৃদয়ের প্রতিমারে না-জেনে, অস্থির,
দুর্ভাগা ভাস্কর যেন, চিহ্নিত শাপের অপমানে,
আপন ললাটে, বক্ষে হাতুড়ির অত্যাচার হানে,

শুধু এক আশা নিয়ে—বহু দূরে অদ্ভুত, গম্ভীর
মন্দিরের মতো মৃত্যু অন্য এক সূর্যের উদয়ে
ফোটাবে যে-সব ফুল অবরুদ্ধ তাদের হৃদয়ে।

এক অদ্ভুত মানুষের স্বপ্ন

শার্ল বোদলেয়ার

স্বাদু সন্তাপ আমার মতো কি অন্যে জানে,
"অদ্ভুত জীব!" তোমায় দেখিয়ে বলে কি ওরা?
—আসন্ন হ'লো মরণ। আমার কামুক প্রাণে
মেশে ত্রাস আর অভিলাষ, খেদ আবেশে ভরা।

যাতনার দান (এ নয় খেয়াল) দৃপ্ত আশা।
আয়ুর বালুকা যত নেমে আসে শূন্যতায়
ততই কষ্ট মাধুরী বিলায় সর্বনাশা,
পরিচিত এই জগতেরে মন বলে বিদায়।

আমি যেন শিশু, যার আকাঙ্ক্ষা নাটকে বাঁধা,
উৎসুকতায় পর্দাকে মানে ঘৃণ্য বাধা...
তারপর হ'লো হিম সত্যের উন্মোচন :

ঘটলো ভীষণ মরণ, এবং সেই উষায়
স্তব্ধ, আবৃত, বিস্ময়হীন আমার মন;—
স'রে গেলো পট, আমি তবু ব'সে প্রত্যাশায়।

রক্তের ফোয়ারা

শার্ল বোদলেয়ার

কখনো আমার দুর্বারবেগ রক্তধারা
মনে হয় ছোটে চাপা কান্নায়-আত্মহারা
ফোয়ারার মতো;—শুনি প্লাবনের দীর্ঘ তান,
কিন্তু কোথায় জখম, মেলে না সে-সন্ধান।

রণভূমি যেন, তেমনি পেরিয়ে চলে, নগর,
ফুটপাত পায় স্বীপের পুঞ্জে রূপান্তর,
সর্বভূতের তৃষ্ণায় আনে নির্বাপণ,
রাঙায় প্রকৃতি দীপ্ত লালের প্রস্রবণ।

অনেক সেধেছি মদেরে—আমায় হানে যে-ভয়
তাকে একদিন চুপি-চুপি করো সূচিদান;
সুরায় আরো যে স্বচ্ছ নয়ন, তীক্ষ্ণ কান!

ভেবেছি, প্রণয় সকল-ভোলানো নিদ্রাময়;
কিন্তু কামেও সূচিশয্যায় অনুক্ষণ
ক্রুর বেশ্যার পিপাসায় ঢালি নিঃসরণ।

'ল্য ফ্লর দু মাল' থেকে। অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

সমালোচনার পদ্ধতি

অমলেন্দু বসু

আজ থেকে একশো বছরেরও আগে জন্ স্টুয়ার্ট মিল্ লক্ষ্য করেছিলেন যে আধুনিক সাহিত্য—আধুনিক সাহিত্য বলতে তিনি বুঝতেন ফরাসী বিপ্লবোত্তর সংস্কৃতি ও সাহিত্য—আশ্চর্যরকমে আত্মসচেতন। বাস্তবিক এত তীক্ষ্ণ আত্মসচেতনতা ইতিহাসের অন্য কোনো যুগেই মানবচিত্তকে এমন অনিবার্যভাবে আচ্ছাদন করেছিল বলে মনে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র "কৃষ্ণকান্তের উইলে" 'সূ' ও 'কু'র অবতারণা করেছিলেন কিন্তু ভালো ও মন্দর দোটানা বিশেষভাবে আধুনিক নয়, মানবচিত্তে ও শিল্পে সে-দোটানা অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রকট। ভালো ও মন্দ নয়, বরং বলা চলে যে সৎ ও সতের, অসৎ ও অসতের যুগপৎ প্রকাশেই আধুনিক আত্মসচেতনতার বৈশিষ্ট্য। বরং আরো বলা চলে যে যা সৎ নয় অসৎও নয় এমন নির্বিশেষের সঙ্গে সমতুল্য নির্বিশেষের সমপ্রকাশেই আধুনিক আত্মসচেতনতা সবচেয়ে বেশি প্রকট। একদা কবি গাইতে পেরেছিলেন 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু নয়ন না তিরপিত ভেল'। লক্ষ যুগের কথা ছেড়েই দিলাম, আত্মসচেতন আধুনিক কবি মাত্র একটি প্রণয়মদির রজনীর অবসানে বলেন :

Last night, ah yesternight, betwixt her lips and mine
There fell thy shadow, Cynara! thy breath was shed
Upon my soul between the kisses and the wine ;
And I was desolate and sick of an old passion,
Yea, I was desolate and bowed my head.

অনুভূতি যখন বহুব্যাপ্ত বহুস্তরী হয়, মানবচিত্ত যখন অবৈকল্যে বঞ্চিত হয়ে খণ্ডিত প্রতীতির সমষ্টিতে পরিণত হয়, শিল্পীর শিল্পচেতনা যখন নিজের বহুধা বিভক্ত চিত্তবৃত্তিগুলিকে শিল্পায়িত করার প্রয়াস পায় তখন তাঁর শিল্প আত্মসচেতন হতে বাধ্য। এই বহুব্যাপ্তির অর্থে, বহুধা বিভাগের অর্থে শিল্প বিশেষভাবে আত্মসচেতন হতে আরম্ভ করে ঊনিশ শতকের শেষার্ধে। শুধু শিল্পীচিত্তই নয় বস্তুত সাধারণভাবে সমগ্র মানবচিত্তই আত্মসচেতন হয়ে উঠল ঐ সময়টাতে। আত্মসচেতনতার এই প্রবল প্রসারের পেছনে নানাবিধ ঐতিহাসিক কারণ অবশ্যই ছিল কিন্তু বর্তমান আলোচনায় সে সব কারণের চেয়েও বেশি দ্রষ্টব্য মনস্তত্ত্ববিদ্যার, মনোবিদ্যার ('সাইকলজি') দ্রুত বিস্তৃতি ও প্রভাব। সাইকলজি বা মনোবিদ্যা অবশ্য ঊনিশ শতকের সৃষ্টি নয় কিন্তু নিঃসংশয়ে বলা যায় যে ঊনিশ শতকেই এ-বিদ্যা নিজ মাহাত্ম্যে বিজ্ঞান বলে পরিচিত হ'ল। আর যেদিন থেকে বিশেষভাবে মনোবিদ্যার চর্চা সুরু হ'ল প্রায় সেদিন থেকেই মনোবিৎ ও শিল্পী মেনে নিলেন যে এ-বিদ্যার সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। ঘনিষ্ঠ তো হবেই কেননা একই আত্মসচেতনতা-ব্যাপ্তি থেকে আধুনিক শিল্প ও আধুনিক মনোবিদ্যা উদ্ভূত।

আধুনিক শিল্পের যদি ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করি, এর অনন্যতা ও নবত্ব যদি আমাদের দৃষ্টিসাধ্য হয় তাহলে একথা বোধ হয় অগ্রাহ্য হবে না যে মানব চেতনা সম্বন্ধে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কৌতূহল আধুনিক শিল্পের প্রধান বিষয়বস্তু, মনোবিশ্লেষণের অনেক

বৈজ্ঞানিক প্রণালী আধুনিক শিল্পের বহু-অবলম্বিত আঙ্গিক। ঊনিশ শতকের শেষাংশে ও বিশ শতকের এতাবৎ কয়েকটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী মানবচিত্তকে (তথা, শিল্পীচিত্তকে) প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। এইকালে সিনেমা, রেডিয়ো প্রভৃতি কতকগুলি যন্ত্রের প্রচণ্ড প্রভাব লক্ষ্য করা যায় সমাজের ও শিল্পের আচরণে, কিন্তু এ সমস্ত যন্ত্র ও এ সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গীও মনোবিদ্যাচর্চার ও মনোবিশ্লেষণের এলাকার বাইরে নয়। শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী হতে পারে ক্যাথলিক অথবা তান্ত্রিক, কমুনিস্ট্ অথবা ভূদানপন্থী ; শিল্প প্রধানত চিত্রধর্মী হতে পারে অথবা গীতিধর্মী, হতে পারে বর্ণনাপ্রবণ অথবা কথোপকথনসর্বস্ব, কিন্তু মনোবিদ্যার সর্বপ্রসারী প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারে না আধুনিক শিল্পের কোনো শাখাই।

শিল্পের উপরে মনোবিদ্যার অভিঘাত কয়েকদিক থেকেই আমাদের লক্ষ্যসাধ্য। (১) মনোবিদ্যার কোনো কোনো তত্ত্বের সাহায্যে আমরা বিচার করতে পারি কোন মূল চিত্তবৃত্তি থেকে শিল্পীর সৃজনীপ্রতিভা উৎসারিত হয়ে থাকে। (২) শিল্পের আঙ্গিকে স্রষ্টার অবচেতনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশগুলির বিশ্লেষণ করে আমরা শিল্পীজীবন, শিল্পী চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি। (৩) শিল্পের ইমেজ বা প্রতীকগুলি মনোবিদ্যাগ্রাহ্য ব্যাখ্যার সাহায্যে বুঝতে পারি। (৪) শিল্পী স্বয়ং হয়তো মনঃসমীক্ষণের কোনো কোনো পদ্ধতি চতুর সতর্কতায় নিজ শিল্পে প্রয়োগ করেছেন, সে প্রয়োগে আমাদের রসসম্ভোগ বাড়তে পারে, মনে হতে পারে শিল্প বেশি পরিমাণে রিয়ালিস্টিক। (৫) সমালোচক হিসাবে আমরা মনঃসমীক্ষণের কতকগুলি পদ্ধতি শিল্পবিচারে প্রয়োগ করতে পারি।

শিল্পের উপরে মনোবিদ্যার আরো কয়েকপ্রকার অভিঘাত অসম্ভব নয়, তবে এই কয়টিই আমার লক্ষ্যগোচর হয়েছে, আর অন্য কোনও অভিঘাত থাকলে তা হয়তো উপরোক্ত প্রকার কয়টির অন্তর্ভুক্তই হবে। এ-অভিঘাতের প্রকারগুলি আসলে তিনটি শ্রেণীতে পড়ে। মনোবিদ্যার সাহায্যে আমরা সৃজনী প্রতিভার বিশ্লেষণ করতে পারি। মনোবিদ্যা থেকে সাহায্য পেতে পারেন শিল্পী, কী শিল্পবিষয় নির্বাচনে কী শিল্পের প্রকরণে। তৃতীয়ত, মনোবিদ্যার বিশ্লেষণপদ্ধতি অবলম্বনে শিল্পসমালোচকের আলোচনাপদ্ধতি সমৃদ্ধতর হতে পারে। বর্তমান আলোচনায় এই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত অভিঘাতই প্রাসঙ্গিক তবে অন্য শ্রেণীগুলি সম্বন্ধে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য নিতান্ত অবান্তর না-ও হতে পারে।

আধুনিক মনোবিৎ শিল্পীকে অ-সামান্য মনুষ্য বলেই জ্ঞান করেছেন। শিল্পীর সম্বিৎ অ-সামান্য সম্বিৎ, সুতরাং মনঃসমীক্ষণের আওতায় এসে পড়ে। শিল্পীর সম্বিৎ যে-অবস্থায় সৃজনপ্রবণ হয় সে-অবস্থা—মনঃসমীক্ষকের বিচারে—একপ্রকার নিউরসিস্। ফ্রয়েড এই চিত্তবিচারের বর্ণনা দিয়েছেন :

The artist is originally a man who turns from reality because he cannot come to terms with the demand for the renunciation of the instinctual satisfaction as it is first made, and who then in phantasy-life allows full play to his erotic and ambitious wishes. But he finds a way of return from this world of phantasy back to reality ; with his special gifts, he moulds his phantasies into a new kind of reality, and men concede them a justification as valuable

reflections of actual life. Thus by a certain path he actually becomes the hero, king, creator, favourite he desired to be, without the circuitous path of creating real alterations to the outer world.

—*The relation of the poet to day-dreaming.*

উদ্ধৃতাংশের ভাবার্থ এ রকম : মানুষের সহজ প্রবৃত্তিজাত যে সব আদিম আকাঙ্ক্ষা বাস্তব-জীবনে চরিতার্থ হতে পারে না সেগুলিকে কালক্রমে ত্যাগ করতেই হয়। শিল্পীর পক্ষে এই ত্যাগ দুঃসাধ্য, অতএব যে-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবজীবনে পূর্ণ হয়নি শিল্পী তাকে চরিতার্থ করেন আপন phantasy-তে, কল্পনালোকে (যাকে গিরীন্দ্রশেখর বসু বলেছেন 'মনোলৌল্য')। কিন্তু এই মনোলৌল্য থেকে জড়জীবনে ফিরে আসারও একটা পথ খুঁজে বার করেন শিল্পী। যে-বিশেষ অন্তঃশক্তিতে তিনি শিল্পী সে-শক্তির প্রয়োগে তিনি কল্পনাগুলিকে এক নূতন বাস্তবতায় রূপায়িত করেন, আর অপর লোকে তারিফ করে বলতে থাকেন যে শিল্পীর বাস্তবতা জড়জগতের বাস্তবতারই অনুরূপ। এমনি করে শিল্পী হয়ে পড়েন নায়ক, নৃপতি, স্রষ্টা ইত্যাদি, যা তিনি হতে চেয়েছিলেন অথচ হতে পারেননি কেননা বাস্তবিক এ রকম হতে হলে বাইরের জড়জগতে অনেক সুকঠিন পরিবর্তন সাধন করতে হ'ত।

শিল্পের এই ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যার অতীব সুন্দর সমর্থন পাওয়া যায় জীবনানন্দ-র কয়েকটি ছত্রে :

মরুমের যত তৃষ্ণা আছে,—
তারি খোঁজে ছায়া আর স্বপনের কাছে
তোমরা চলিয়া আস,—
তোমরা চলিয়া আস সব !—
ভুলে যাও পৃথিবীর ঐ ব্যথা—ব্যাঘাত—বাস্তব !...
সকল সময়
স্বপ্ন—শুধু স্বপ্ন জন্ম লয়
যাদের অন্তরে,—
পরস্পরে যারা হাত ধরে
নিরালা ঢেউয়ের পাশে-পাশে,—
গোধূলির অস্পষ্ট আকাশে
যাহাদের আকাঙ্ক্ষার জন্ম—মৃত্যু,—সব,—
পৃথিবীর দিন আর রাত্রির রব
শোনে না তাহারা !

দিনের উজ্জ্বল পথ ছেড়ে দিয়ে
ধূসর স্বপ্নের দেশে গিয়া
হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার নদী
ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায়—ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায় যদি,—
তবে ঐ পৃথিবীর দেয়ালের 'পরে
লিখিতে যেও না তুমি অস্পষ্ট অক্ষরে
অন্তরের কথা !—

উজ্জ্বল আলোর দিন নিভে যায়,
মানুষেরা আয়ু শেষ হয় !
পৃথিবীর পুরোনো সে-পথ
মুছে ফেলে রেখা তার,—
কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ
চিরদিন রয় !

শিল্পপ্রকৃতির এ-ব্যাখ্যা হৃদয়গ্রাহী বটে কিন্তু অন্যান্য ব্যাখ্যার চেয়ে এর গ্রাহ্যতা বেশি নয়। এ-ব্যাখ্যা সব রকম শিল্প সম্বন্ধে খাটে না, এর প্রয়োগ-পরিধি সংকীর্ণ। সর্বোপরি, ফ্রয়েড শিল্পের মৌল সৃজনীশক্তি সম্বন্ধে নীরব থেকেছেন। With his special gifts (যে-বিশেষ অন্তঃশক্তিতে তিনি শিল্পী) এই কথা কয়টিতে শিল্পীর সৃজনীশক্তির উল্লেখ মাত্র করেছেন বটে, সে-সৃজনীশক্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করেননি। অতএব ইস্‌থেটিক্‌স্‌-শাস্ত্রে ফ্রয়েডের এ-ব্যাখ্যা উঁচু পর্যায়ে পড়ে না, সমালোচনার পদ্ধতিতে এ-ব্যাখ্যার প্রয়োগযোগ্যতা খুবই সীমাবদ্ধ।

আধুনিক সাহিত্যে বহু লেখক মনঃসমীক্ষণের কোনো কোনো পদ্ধতি নিজ নিজ শিল্পে প্রয়োগ করেছেন, সে-প্রয়োগে অভিনবত্ব যে-পরিমাণে, সার্থকতা তার চেয়ে ন্যূন নয়। ইয়োরোপীয় শিল্পে যাকে stream of consciousness বলা হয়েছে, সেই সম্বিৎপ্রবাহকে শিল্পে ধরে রাখার সফল প্রয়াস বাঙলা সাহিত্যেও দুর্লভ নয়। একদা জীবনের বহিরঙ্গই ছিল শিল্পের বিষয়বস্তু। যে-স্থূল জড়কর্ম, যে-বহির্জীবন ছিল সকল মানুষেরই দৃষ্টিসাধ্য, শ্রুতিসাধ্য ও স্পর্শসাধ্য, সে-জীবন প্রকাশ করতেই শিল্পী ব্যস্ত থাকতেন। এই বহির্জীবনের ভিত্তিতে যতখানি অন্তর্জীবন, যতগুলি মনোবৃত্তি, সৌধায়িত করা সম্ভব তা তাঁরা করতেন কিন্তু শিল্পে এমন কোনো অন্তরঙ্গের স্থান ছিল না যা বহিরঙ্গবর্জিত। আজ মনোবিদ্যার প্রচণ্ড অভিঘাতের ফলে যাবতীয় শিল্প ক্রমেই অধিক পরিমাণে অন্তর্জীবনে আশ্রয় নিচ্ছে। আধুনিক ধারণায় মানবসত্তার প্রকৃত পরিচয় স্থূল ঘটনায় নয়, প্রকৃত পরিচয় মনোবৃত্তির প্রবাহী ধারায়। অতএব এই প্রবাহী ধারা আধুনিক শিল্পের বিষয়বস্তু। এই কারণেই টলস্টয়ের গল্পে পাতার পরে পাতায় কোনো স্থূল ঘটনা ঘটছে না, আমরা শুধু জানতে পাই জনৈক মুমূর্ষু ব্যক্তির সম্বিতে কত ভাবনা যাচ্ছে আর আসছে। এই কারণেই প্রুস্তের উপন্যাসে শতাধিক পৃষ্ঠার বর্ণনায় একটি মাত্র স্থূল কার্যই পাওয়া যায়—জনৈক ব্যক্তি প্রাতঃকালে ঘুম থেকে উঠলেন, গায়ের আড়মোড়া ভাঙলেন আর জানালা দিয়ে নিচে রাস্তার দিকে তাকালেন; এই কারণেই মেটারলিঙ্কের নাটকে স্ত্রীপুরুষ মুখোমুখি বসে নিরন্নজে দীর্ঘ কথোপকথনে নিযুক্ত থাকতে পারেন; আর এই কারণেই এ যুগে স্যামুয়েল রিচার্ডসনের মন্থরগতি উপন্যাসগুলির ও লরেন্স স্টার্ণের খামখেয়ালি উপন্যাসের কদর বেড়ে গেছে।

আধুনিক শিল্পের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকরণই মনোবিদ্যা থেকে আহৃত। চিত্রশিল্পে ইম্‌প্রেশানিজম্‌ ও এক্‌স্‌প্রেশানিজম্‌, চিত্রশিল্পে ও সাহিত্যে সুরিয়ালিজ্‌ম্‌, মনোবিদ্যার কাছে অশেষভাবে ঋণী। যদি শুধু সাহিত্যের কথা চিন্তা করি তাহলে মনে পড়বে আধুনিক নাটকে একাধিক দৃশ্যের বা ঘটনার সমকালীন অবতারণা, স্বগতোক্তির অকৃপণ প্রয়োগ, কয়েকটি চরিত্রণ-প্রণালী। মনে পড়বে আধুনিক উপন্যাসের নিবিড় অন্তর্মুখীনতা, কাহিনীর অনবরুদ্ধ প্রবাহ, ঘনীভূত চরিত্রণ। মনোবিদ্যা থেকেই আমরা পেয়েছি Internal Monologue ("মৌন স্বগতোক্তি"?), যার প্রভূত প্রয়োগ দেখতে পাই আজকালকার

উপন্যাসে, নাটকে, জীবন-চরিতে, কাব্যে, কী চরিত্র সৃষ্টির প্রয়োজনে, কী একাধিক অনুভূতির যুগপৎ অভিব্যক্তিতে।

মনে পড়ে,—শোনো,—মনে পড়ে
নবমী ঝরিয়া গেছে নদীর শিয়রে,—
(পদ্মা—ভাগীরথী—মেঘনা—কোন্ নদী যে সে,—
সে সব জানি কি আমি!—হয়তো বা তোমাদের দেশে
সেই নদী আজ আর নাই,—
আমি তবু তার পাড়ে আজো তো দাঁড়াই!)

—জীবনানন্দ দাশ, "পরস্পর"

পাশাপাশি দু'টি কণ্ঠস্বর বিদ্যমান : একটি উচ্চকিত, শ্রোতার উদ্দেশে নিবেদিত, অপরটি অনুচ্চারিত, অথচ দু'টি স্বরে মিলেছে সম্পূর্ণ ভাবপ্রকাশের জন্য, একটি স্বর আলগোছে মিলে গেছে অপরটির সঙ্গে। আরেকটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক :

আলো-ভরা বড়ো রাস্তা, লোক-ভরা, কোলাহল-চলাচল-ভরা—
(দু'জনায় গল্প জমিয়াছে!)
অনেক স্রোতের মতো দিকে-দিকে গর্জিছে ট্র্যাফিক,
ঝরিছে অজস্র আলো, মোটারের, দোকানের, ইলেট্রিকের—
(বোবা ওরা, বোকা ওরা, স্তব্ধতায় মুখোমুখি বসে ছিলো ওরা,
আমরা অনেক কথা বলি,
আমরা অনেক কথা শুনি,
আলোটা সিঁড়িতে রেখে গল্প করি—গল্প করি আমরা দু'জন।)

—বুদ্ধদেব বসু, "অন্ধকার সিঁড়ি"

এখানে দু'টি সুরে মিলে একীভূত হয়নি, তারা আলাদা রয়ে গেছে, আর তেমনটি রাখাই কবির উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। একটি সুর শুধু বর্ণনা করে যাচ্ছে : ছেলেটি ও মেয়েটি যতক্ষণ ঘরে ছিল, ছিল নীরব আড়ষ্ট; এখন প্রত্যাসন্ন বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তটিতে, সদর রাস্তার আলো চলাচল কোলাহলের সন্নিকটে এসে জমল তাদের গল্প। এ-বর্ণনার মাঝখান দিয়ে কেটে বেরিয়েছে একটি মন্তব্য, সে-মন্তব্য ছেলেটির নিজেরই সম্বন্ধে অথচ সে যেন একটা নৈর্ব্যক্তিক মন্তব্য। ছেলেটি যেন তার আধঘণ্টা আগের সত্তাকে দূর থেকে বিচারকের দৃষ্টিতে দেখছে—"বোবা ওরা, বোকা ওরা"—কেননা সেই আগের নীরব সত্তার তুলনায় এখন "আমরা অনেক কথা বলি, আমরা অনেক কথা শুনি"। ছেলেটির আত্মসমালোচনা প্রকাশ পেয়েছে মৌন স্বগতোক্তিতে। সাহিত্যের প্রকরণ হিসাবে মৌন স্বগতোক্তি আধুনিক সাহিত্যে অতীব মূল্যবান আর এ-প্রকরণের উৎস মনোবিদ্যায়।

যাকে বলে ভাবানুষঙ্গ—association of ideas— তার তত্ত্ব একটা নতুন কিছু নয়, আঠারো শতকে হার্টলে ও হিউম এ-তত্ত্বটি ইংল্যাণ্ডে চালু করেছিলেন আর এ-তত্ত্বে বিশ্বাস নিয়ে ওয়র্ড্স্ওয়র্থ্ তাঁর "প্রিলিউড" কাব্য লিখতে বসেছিলেন, কিন্তু সাহিত্য কর্মের প্রকরণ হিসাবে ভাবানুষঙ্গের প্রয়োগ সুরু হয় আধুনিক মনোবিদ্যার যুগেই। ভাবানুষঙ্গের দু'টি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যাক :

পাহাড়তলীতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো;

স্তূপে স্তূপে মেঘ আকাশের বুক চেপে ধরেছে,
পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমা গুহায় গর্তে সংলগ্ন,
মনে হয় নিশীথ রাত্রের ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

—রবীন্দ্রনাথ, "শিশুতীর্থ"

মৃতরাক্ষস, বুকচাপা দুঃস্বপ্ন, আর ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তিনটি রূপকল্পই এক ভাবানুষঙ্গের সূত্রে অনুস্যূত, তিনটিতেই মৃত্যু ও ধ্বংসের বিকার সূচিত হচ্ছে। ছত্র কয়টির কাঠামো তর্কের বা যুক্তির বাঁধুনিতে নয়, ভাবানুষঙ্গে সম্পৃক্ত অনুভূতিতে। এই কবিতাতেই নিচের ছত্র কয়টি মেলে :

তাতে একত্রে মিলেচে পরশ্রীকাতরের কানাকানি, কুৎসিত জনশ্রুতি,
অবজ্ঞার কর্কশ হাস্য।
সেখানে মানুষগুলো সব ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো
ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্চে,
মশালের আলোর ছায়ায় তাদের মুখে
বিভীষিকার উল্কি পরানো।

এখানেও উপমা দু'টি ভাবানুষঙ্গে মিলেছে। পরশ্রীকাতরতা, জনশ্রুতি ও অবজ্ঞার অন্যতম ভাণ্ডার ইতিহাসে। পরশ্রীকাতরতা, জনশ্রুতি ও অবজ্ঞায় মণ্ডিত হয়ে ঐতিহাসিক নরনারী (অথবা তাদেরই সমতুল্য কাব্যোক্ত মানুষেরা) বিকৃতি দর্শন হয়ে পড়েছে। এমন কথা বলা যায় যে উপমা মাত্রেই ভাবানুষঙ্গের দৃষ্টান্ত কিন্তু সেটা উপমার আপাতবিচার মাত্র। প্রধানত ভাবানুষঙ্গ থেকে যে-উপমা উদ্ভূত তার লজিক্যাল বাঁধুনি ক্ষীণ, প্রবল তার ভাবসমৃদ্ধি আর সে জন্যেই আধুনিক রোমাণ্টিক কাব্যে ভাবানুষঙ্গ নিয়ত-প্রযুক্ত প্রকরণ। আধুনিক কাব্যের উচ্চারণে যে ঠাস-বুননো বাঁধুনি সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় সে-বাঁধুনির জন্য ভাবানুষঙ্গ অনেক পরিমাণে দায়ী। ভাবানুষঙ্গ উপমাতে যেমন পাওয়া যায় তেমনি বাক্ধ্বনিতে, পুনরাবৃত্ত রূপকল্পে বা উল্লেখে, বিশেষ শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহারেও পাওয়া যায়।

আর কত লাল সাড়ী আর নরম বুক, আর টেরী-কাটা মসৃণ মানুষ,
আর হাওয়ায় কত গোল্ড ফ্লেকের গন্ধ,
হে মহানগরী!

—সমর সেন, "নাগরিক"

ছত্রকয়টিতে "আর" শব্দটি পুনঃপুনঃ ব্যবহার হওয়াতে স্পষ্টতঃই ভাবানুষঙ্গের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। "লাল সাড়ী", "নরম বুক", "টেরী-কাটা মসৃণ মানুষ" ও "মহানগরী"-র অনুষঙ্গ আদৌ দুর্বোধ্য নয়। অন্য কয়েকটি তুলনীয় ছত্র উদ্ধৃত করা যাক :

বড়োবাজারের উপল উপকূলে
জনগণের প্রবল স্রোত
উগারিছে ফেনা
আর বিড়ির আর সিগারেটের আর উনুনের আর মিলের ধোঁয়া
আর পানের পিক্
আর দীর্ঘশ্বাস
বড়োবাবুর গঞ্জনায়
বড়ো সাহেবের কটা চোখের ব্যঞ্জনায়

দাম্পত্যমিলনের শ্রান্ত সম্ভাবনায়
অপত্যাধিক্যের অনুশোচনায়

—বিষ্ণু দে, "টম্পা-ঠুংরি"

উদ্ধৃত এ-অংশেও ভাবানুষঙ্গের সহায়ক হিসাবে "আর" শব্দটি পুনঃপ্রযুক্ত হয়েছে, বড়োবাজার বড়োবাবু ও বড়োসাহেবের "বড়ো" শব্দটি পুনরাবৃত্ত হয়েছে, তাছাড়া গঞ্জনায়-বঞ্জনায়-সম্ভাবনায়-অনুশোচনায় এ-চারটি শব্দের অনপ্রাসে ভাবানুষঙ্গ নিবিড়তর হয়েছে। এক্ষেত্রেও ভাবানুষঙ্গ স্বচ্ছ ও সরল, এর করণকৌশলে যদি বা কিঞ্চিৎ নবত্ব আছে মহত্ত্ব কিছু নেই, বরং বলা যায় এ কৌশল খানিকটা বালসুলভ। পক্ষান্তরে যে-ভাবানুষঙ্গ পুনরাবৃত্ত রূপকল্পের উপরে অথবা উল্লেখের উপরে প্রতিষ্ঠিত, সে-ভাবানুষঙ্গ হৃদয়ংগম হওয়া সতর্ক চিন্তাসাপেক্ষ কেন না তার গড়নে কবিকৃতি অনেক বেশি জটিল ও কুশলী আর তার রেশ থেকে যায় পাঠকের স্মৃতিতে দীর্ঘকাল। এহেন জটিল ভাবানুষঙ্গের দৃষ্টান্ত আধুনিক শ্রেষ্ঠ ইংরেজি কবিতায় প্রচুর মেলে, আধুনিক বাঙলা কাব্যেও দুর্লভ নয়। বিষ্ণু দে-র "ওফেলিয়া" ও "ক্লেসিডা" এ-দুটি কবিতায় রূপকল্পের ও উল্লেখের অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। "ক্লেসিডা" কবিতাটির ভাবকেন্দ্র সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন কবিবন্ধু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত "চোরাবালি" কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায়। যদিচ সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন যে কবিতা মাত্রেই অনির্বচনীয় আর উৎকৃষ্ট কাব্যের মর্মোদ্ঘাটন তাঁর অভিপ্রেত নয় তথাপি সুধীন্দ্রনাথের দ্যোতনা সমৃদ্ধ সংক্ষিপ্তসারের উপরে নির্ভর করে কেউ যদি কবিতাটির মর্মোদ্ঘাটন নয়, তার ভাব-বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন তাহলে এ-কবিতাটিতে ভাবানুষঙ্গের গুরুত্ব তিনি অবশ্য বুঝতে পারবেন। পাঠক সর্বক্ষেত্রে বিষ্ণু দে-র অনুষঙ্গ-প্রয়োগে ও উল্লেখ-কৌশলে প্রবেশ না-ও করতে পারেন (আমি পারিনি বলেই আমার আশঙ্কা হচ্ছে) কিন্তু কয়েকটি অনুষঙ্গ ও উল্লেখ নিশ্চয় তাঁকে হাতছানি দেবে আরো এগিয়ে যাবার জন্য। কবিতার কোনো কোনো স্তবকে স্বৈরিণী ক্লেসিডার ও অন্যত্র অমর রূপেসী হেলেনের উল্লেখগুলি অসংলগ্ন নয় : ক্লেসিডার থমকানো চোখে বরাভয় চমকায়, তার আশ্লেষের পরিণাম মহারাজ দক্ষের ক্রতু ধ্বংসের সঙ্গে তুলনীয় (৪ স্তবক); তার বাক্যের পরিমণ্ডলে ভিড়-করা মেঘের ঠেলাঠেলি, ঈশান বিষাণ ও দিশাহারা বজ্র (৮ স্তবক); তার প্রভাবে যে বিভ্রম জন্মে, বৈতরণীর পারে এসে জনহীন তপ্ত-মরুর ক্লান্ত আঁধারে, কাণ্ডারীহীন বালুকাবেলায়, যে-বিভ্রমমোচনার্থে খুঁজতে হয় প্যাণ্ডারাসকে (২ ও ৯ স্তবক) [ট্রয়রাজ ও ক্লেসিডার প্রণয়ে দূতীকার্য করেছিল প্যাণ্ডারাস—একথা এ-কাহিনীর সমস্ত কথক মেনেছেন বোকাচ্চো থেকে শেক্‌স্‌পীয়র অবধি] ক্লেসিডা তাহলে প্রাচীনাগত রূপকথার "রূপসী সর্বনাশী" (The Fatal Woman)—তার প্রণয় অলাতচক্রে চক্রমণ (১৫ স্তবক); তার মরণমায়া (২০), তার উন্মাদকারী প্রভাব (২১), আজো ট্রয়রাজ-এর স্মরণে শিহরণ আনে—"স্মরণে তোমার হানে আজো তরবারি" (২৪)। ক্লেসিডা-কাহিনীর উল্লেখে হেলেন কী করে এলো? সুধীন্দ্রনাথ তাঁর সংক্ষিপ্তসারে সে বিষয়ে কিছু বলেননি, আমার অনুমান হয় ক্লেসিডা-কাহিনীর সঙ্গে হেলেন-কাহিনী সংমিশ্রিত করে বিষ্ণু দে আমাদের চিত্তে "রূপসী সর্বনাশী"র রূপকবোধ দৃঢ়তর করেছেন। একে তো ক্লেসিডা ও হেলেন বাঁধা পড়েছেন একই ধ্বংসলীলার আবর্তে। তাছাড়া দু'জনেই প্রথম প্রণয়ঘাতিনী। আর হেলেন তো লোক ললামভূতা সুন্দরীশ্রেষ্ঠা যাঁর জন্যে জ্বলেছিল ইলিয়মের আকাশচুম্বী সৌধরাজি! ক্লেসিডার রূপ সম্বন্ধে বোকাচ্চো, চসর, হেন্‌রিসন্, শেক্‌স্‌পীয়র লিখেছেন অল্পবিস্তর কিন্তু

হোমর সে বিষয়ে নির্বাক। তথাপি এমন অনুমান অসংগত নয় যে যাঁর জন্যে রাজকুমার ট্রয়লাস ও বীর ডাইওমিড্ উভয়েই হৃদয় হারালেন তাঁর রূপও তুচ্ছ নয়। হেলেন ও ক্লেসিডা উভয়েই পরমাসুন্দরী, উভয়েই লোক সংহারের শোকসম্ভারের কারণ। বিষ্ণু দে আমাদের চিত্তে প্রশ্ন জাগাচ্ছেন, "ট্রয়ের প্রাচীর ভগ্নুর কেন?" পটভূমিতে দুই রূপসী সর্বনাশী, তার সামনে (কবিতাটির যতটুকু আমি বুঝতে পেরেছি) মথিত হৃদয়ের প্রতীক-রূপে রজনীগন্ধার উল্লেখ (৬ স্তবক ও ১৮), স্তব্ধতার উল্লেখ (১৬, ২৩ স্তবক)।

এ-কবিতায় ভাবানুষঙ্গের যে-অনুমান আমি উপরে পেশ করেছি তা যদি ত্রুটিপূর্ণও হয় (হওয়া খুবই সম্ভব), যদিও আরো অনেক সূক্ষ্ম-ভাবানুষঙ্গের উল্লেখ আমি করিনি কেননা এ-কবিতার বিশদ বিশ্লেষণ আপাতত আমার মূল কর্ম নয় আর তা ছাড়া হয়তো সে-সব সূক্ষ্ম কৌশল আমার হৃদয়ংগমই হয়নি (সেটাও খুবই সম্ভব), তবুও আমার কথাটি থেকে যায় যে আধুনিক কাব্যের প্রকরণ হিসাবে ভাবানুষঙ্গের প্রয়োগ অতি মূল্যবান, কোনো কোনো বাঙলা কবিতায় এ-প্রকরণের সার্থকতা রীতিমতো বিস্ময়কর। যিনি আধুনিক কবিতার নিষ্ঠাবান সমালোচনায় নিযুক্ত হতে চান (অথবা আধুনিক কথাসাহিত্যের ও নাটকের) তিনি ভাবানুষঙ্গের প্রয়োগ সম্বন্ধে অবজ্ঞাসম্পন্ন হতে পারেন না। ভাবানুষঙ্গের সযত্ন অধ্যয়ন বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা আধুনিক সাহিত্যালোচনার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার।

এই সংগে একথাও বলা দরকার যে ভাবানুষঙ্গ মাত্রেই সার্থক শিল্প নয়। কবি যদি ভাবানুষঙ্গ প্রয়োগ করে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে তিনি মনোবিদ্যার শিল্প-সম্ভাবনায় প্রত্যয়ী কিন্তু তা থেকে এমন প্রমাণ হবে না যে তাঁর নিজের প্রয়োগও সফল। বিষ্ণু দে-র যে-কবিতাটির সংক্ষিপ্ত সবিধ আলোচনা উপরে করেছি সেটির কথাই ধরা যাক, সবিনয়ে স্বীকার করব যে কবিতাটির কোনো কোনো অংশে যদিও আমি অভিভূত হয়েছি, অন্য কতকগুলি অংশে যদিও অসমবৃদ্ধ ঔৎসুক্য বোধ করেছি, কবিতাটির সামগ্রিক কোনো প্যাটার্ন বা ছক আমার বোধগম্য হয়নি আর সেজন্য আমার রসোপলব্ধি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ("সমালোচনার পদ্ধতি"-শীর্ষক প্রবন্ধ কয়টিতে আমি এতাবৎ সময়ে আমার ব্যক্তিগত মত ও প্রতিক্রিয়া পরিহার করেই চলেছি কিন্তু যে-বিশেষ কথাটি সম্প্রতি বলতে চাচ্ছি তার জন্য রূঢ় উত্তম পুরুষের অবতারণা করতেই হচ্ছে।) সম্ভবত এ-কাব্যপাঠে আমার সে-পারদর্শিতা নেই যার উল্লেখ করেছেন সুধীন্দ্রনাথ তাঁর ভূমিকায়। পারদর্শিতার সে-অভাব পাঠকের পক্ষেই শোকাবহ কেন না তদ্দরুণ তাঁর সংগে কবির "হৃদয়সংবেদ্য সহযোগ" ঘটল না (কথাটি উক্ত ভূমিকা থেকে নেওয়া) আর সেজন্য "সৌন্দর্য কোন্ ছার, সত্যসন্ধানও পণ্ডশ্রম"। বস্তুত কাব্যের communication theory তে এই হৃদয়সংবেদ্য সহযোগ আসল কথা। কাব্যের দুরূহতা সম্বন্ধে যে-অভিযোগ পিচ্ছিল রসনায় বহুকথিত, সে-অভিযোগের মূল অনুসন্ধানে প্রায় সর্বত্রই আমরা পেণ্ছব পাঠকের আলস্যে বা অজ্ঞতায়। হৃদয়সংবেদ্য সহযোগ যে হেতু উভয়পক্ষীয় দায়িত্ব, কবিতা গ্রহণের জন্য পাঠককেই বেশি অগ্রসর হতে হবে বৈ কি! বিশেষত যখন কাব্যে কোনো নূতন প্রকরণের প্রবর্তনা হয়, পাঠককে তখন বিশেষ করে সমীহিত হতে হবে, নূতন চশমা পরার সুড়সুড়িতে যেমন কিছুকাল অভ্যস্ত হয়ে চশমাটির সংগে নিজেকে মানিয়ে নিতে হয় এ-প্রকরণের সংগেও নিজের সংবেদনা তেমনি মানাতে হবে। সহযোগের দায়িত্ব সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত করার পরেও একটা কথা থেকে যায় যে কবিও নিরঙ্কুশ নন, নূতন প্রকরণের প্রবর্তনায় নিযুক্ত হয়েছেন বলেই সে-প্রবর্তনা কৃতকার্য হয়েছে এমন মনে করার কারণ নেই। যতই বলি না কেন, চরম বিচারে কবিতাটি

প্রকরণও নয়, বিষয়বস্তুও নয়, প্রতীক ভাবানুষঙ্গ অলঙ্কার ছন্দ কোনোটারই সমার্থক নয়। এ সমস্তও আরো অনেক কবিতার উপাদান মাত্র। যতগুলি উপাদানের সমষ্টিতে কবিতাটি গড়ে উঠেছে সেগুলির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্তার উপরে একটি সামগ্রিক সত্তা, একটা প্যাটার্ণ বা ছক থাকা চাই, সে-প্যাটার্ণটিই কবিতা কেননা সে-সামগ্রিক শিল্পসত্তায় কবির তাৎক্ষণিক আপন সত্তা সমুদ্ভাসিত। মিল্‌টন্ চেয়েছিলেন মহাকাব্য লিখতে আর সে-মহাকাব্যের সামগ্রিক প্যাটার্ণ এঁকে তোলার জন্য তাঁর প্রয়োজন ছিল হাজার হাজার ছত্রের। এলিয়ট যদি ৪৩৩ ছত্রে আধুনিক মহাকাব্য লিখতে পারেন আর বিষ্ণু দে পারেন ৮৪ ছত্রে, তা'হলে ছত্রস্বল্পতার জন্য আপত্তি তো করব না বরঞ্চ তাঁদের সাহসিক নবত্ব সন্ধানে চমৎকৃত হব। কিন্তু সেই সঙ্গে জানতে চাইব এই হ্রস্বীকৃত রচনায় কাব্যের প্যাটার্ণ বিদ্যমান কিনা।

আমার শিক্ষাসঙ্কুল বিবেচনায় বিষ্ণু দে-র "ক্রেসিডা"তে কাব্যের সামগ্রিক প্যাটার্ণ নেই, আছে অংশ বিশেষের ও উপাদান বিশেষের ঔজ্জ্বল্য, আভাস আছে যে ক্রেসিডা-কাহিনীর বহু পর্যায়ী ইতিহাস সম্বন্ধে কবি ওয়াকিবহাল, প্রমাণ আছে যে এ-কাহিনীতে কবি পেয়েছেন প্রেমজনিত ট্র্যাজেডির একটি বিশেষ ব্যাখ্যা। কবিতাটিতে আছে প্রতীক, অনুষঙ্গ, উল্লেখ, আছে একাধিক ভাবের সম্পৃক্তি, আছে ভাব ও ভাষার এমন সংক্ষেপীকরণ যেন, কবি বাক্যের গোষ্পদে মহাকাব্যের ভাবরাজির আকাশ দর্শন করছেন। এইসব সংক্ষেপীকরণ, উল্লেখপ্রবণতা, প্রতীক অনুষঙ্গ ও ভাবের সংগ্রন্থন আধুনিক ইয়োরোপীয় কাব্যের প্রচলিত প্রকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বিষ্ণু দে হয়তো এসব প্রকরণের আদর্শ পেয়েছেন এলিয়টের কাব্যে এমন মনে করা কষ্ট-কল্পনা না-ও হতে পারে। আধুনিক প্রকরণ ও সনাতন প্রকরণে মস্ত প্রভেদ যে সনাতন প্রকরণে ভাবসমুচ্চয় একটা বহিরঙ্গ লজিক দ্বারা গ্রথিত থাকত, কবিতার এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের প্রকাশ্য সংযোগ সম্পর্ক থাকত। আধুনিক প্রকরণে সে-সংযোগ সম্পর্ক আদৌ প্রকাশ্য নয়, ভাবসমুচ্চয়ের প্রবাহে কোনো বহিরঙ্গ যুক্তির শৃঙ্খলা প্রায়ই থাকে না, সে-শৃঙ্খলা সংবেদী পাঠক কল্পনা করে নেন প্রতীক উল্লেখ অনুষঙ্গের ইঙ্গিতে। এ-জন্যই আধুনিক কাব্যে অনুষঙ্গ মূল্যবান। বিষ্ণু দে-র "ক্রেসিডা"তে, আমার বিচারে, প্রকরণগুলি উপস্থিত কিন্তু তারা এত হ্রস্ব, এত ক্ষীণ (প্রায় অদৃশ্য) সংযোগ সম্পর্ক তাদের, ভাবানুষঙ্গে প্রবহমানতার ও সঙ্গতির এত অভাব যে কবিতার আলাদা অংশগুলি আলাদা-ই রয়ে গেছে, কবির সৃজনীপ্রতিভা কোনো সুঠাম প্যাটার্ণে রূপায়িত হয়নি। সুধীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রকরণগুলি যেন "চকিত চাতুরীর" শরণ নিয়েই ক্ষান্ত।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে মনোবিদ্যা থেকে আহৃত ভাবানুষঙ্গ আধুনিক সাহিত্যিকের ও সমালোচকের পক্ষে মূল্যবান প্রকরণ বটে কিন্তু তার মূল্য সর্বত্রগ্রাহ্য নয়। ভাবানুষঙ্গ অসার্থক, যেমন কিনা প্রতীক ছন্দ অলঙ্কার প্রভৃতি অন্য যে কোন প্রকরণই অসার্থক, যদি না সে-প্রকরণ একটা সুষম সমগ্রতায় মিশে যেতে পারে।

চীনে লণ্ঠন

লীলা মজুমদার

মাঝে মাঝে মল্লিকা ভাবে দুঃখ আবার কি? দুঃখ তো একটা মন-গড়া জিনিস, দুঃখ পাব না মনে করতে পারলে আবার দুঃখ কোথায়! আপিশের অন্য মেয়েরা দল বেঁধে এখানে-ওখানে যায়, মল্লিকা এক-একদিন তাদের সঙ্গে যায়। তারা অবাক হয়, মল্লিকাকে তা'হলে বাইরে থেকে যতটা দেমাকী মনে হয়, আসলে ততটা নয়; অবাকও হয় তারা, খুসিও হয়। এই তো কত সহজে মানুষের মন পাওয়া যায়। তাদের অনেকেরই ছেলে-বন্ধু আছে, তারাও দু'চারজনা এসে জোটে। হয়তো বা সিনেমা দেখতে গেল, সিনেমা ভাঙলে কোথাও গিয়ে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করলো, বেশ সন্ধ্যাবেলাটা কেটে গেল। শুধু যদি মনের ভেতরকার ফাঁকা-ফাঁকা বোধটাকে ভরিয়ে দেওয়া যেত। বুকের ভেতরটা যদি ভালো জিনিস দিয়ে ভরাট হ'য়ে থাকত তা হলে যে কি ভালোটাই হতো। ঐ চঞ্চল পাখিটা তা হ'লে আর অনবরত ডানা ঝাপটে মল্লিকার প্রাণ ওষ্ঠাগত ক'রে তুলতে পারত না। শূন্য বাড়িতে ফিরে এসে বালিশে মুখ গুঁজে মল্লিকা প্রহরগুলি গোণে। সুখ কে চায়? চাই-চাই ক'রেই তো জীবনের চব্বিশটা বছর কেটে গেল। শেষে মুঠোর মধ্যে কি বাকি থাকল? রাশি-রাশি চাওয়ার মধ্যে যেগুলি পেয়েছিল তারই বা কি চিহ্ন রইল? শ্যামলী নিচে বিছানা ক'রে শোয়, শ্যামলী নিঃসঙ্গ, তাই একা শুতে ভয় পায়। কিসের ভয়, শ্যামলী? ভূতের ভয়? চোরের ভয়? না দিদি, ভূতের মাদুলী আছে, আর গয়নাগুলো গিয়ে অবধি চোরের ভয়ও সেরে গেছে। তবে কিসের ভয়? দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শ্যামলী বলে, তুমি বুঝবে না, দিদি, একার ভয় বড় ভয়।

একার ভয়? মল্লিকার আবার একার ভয় কোথায়? মল্লিকার জীবনটা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব দিয়ে ঠাসা। আগ্রায় মল্লিকাদের বাড়িতে ইচ্ছা করলেও কারো একা হবার উপায় নেই। সব কিছুর সেখানে ভাগীদার আছে। রাগ হ'লে, দুঃখ হ'লেও একা হবার উপায় নেই, পাঁচজনের বিদ্রূপে আর সহানুভূতির জন্য রাগ করা চলে না। শুধু ওদের বাড়িতে নয়, সব কিছুর রিপোর্ট যায় পলাশের মামাবাড়িতেও, মা পর্যন্ত সব কথা মার বন্ধু পলাশের বড় মামিকে না ব'লে থাকতে পারেন না। একা হবার জো নেই মল্লিকার।

এখানেও সোমনাথবাবু, মিমিদি যতক্ষণ না মনের কথা টেনে বার করেছেন একদণ্ড রেহাই দেবেন না, রাঙা দিদিমণি কারো মনের নিভৃতির ধার ধারেন না, মিনামাসিমা ভাবেন সকলেরই মন বুঝি এক-একটা সরকারী বাগানের মতো। মালীদের যত্নে যেখানে শুকনো ঘাস-পাতা জমতে পারে না, গাছ-ছাঁটা কাঁচি নিয়ে অনাবশ্যক ডাল-পালা মুড়িয়ে দেওয়া হয়, জল দিয়ে দিয়ে ঘাসগুলোকে সবুজ ক'রে রাখা হয়, রোলার আর মেসিন দিয়ে সমান করা হয়, পুকুর থাকলে তার মধ্যে কাউকে নামতে দেওয়া হয় না, পদ্মফুল ফোটানো হয়, তাও সাধারণ পদ্ম নয়; আফ্রিকার বিরাট পাতাওয়ালা বিশাল পদ্ম, গাছের গোড়ায় গোড়ায় লেবেল ঝোলানো থাকে, কোন্‌টা কি কারো চিনতে বাকি থাকে না। এমনি ধারা লোক দিয়ে মল্লিকার জীবন ভরা, একা হবার জায়গা নেই। ভাবতে ভাবতে নিদারুণ নৈঃসঙ্গ তার সমস্ত অন্তঃকরণকে প্লাবিত করে।

শ্যামলী উঠে বসে।—ঘুম হচ্ছে না, দিদি? জল খাবে?'

—নারে শ্যামলী, তুই ঘুমো, আমার এমনি হ'য়েই থাকে।

এক একদিন মিনামাসিমা গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যান, রাঙা দিদিমণিকে ঠেকানো যাচ্ছে না। সবাই ভাবে এবার বোধ হয় রাঙা দিদিমণির হ'য়ে এল, যে ক'টা দিন বাকি আছে, কোনগতিকে পার ক'রে দিতে পারলেই হলো। রাঙা দিদিমণি দোতলার ঝোলানো বারান্দায় আরাম-কেদারায় বসে জগৎ দেখতে চান। মিনামাসিমাদের অত সময় কোথায়, মল্লিকা গদি-বাঁধানো নীচু টুল টেনে পাশে এসে বসে।

রাঙা দিদিমণি বলেন,—হ্যাঁরে, পলাশ বলছিল তুই নাকি আজকাল ভারী স্বাধীন হয়েছিস, একা বাড়িতে বাস করিস।

মল্লিকা রেগে যায়,—স্বাধীন তো আমি অনেকদিন আগে থাকতেই হয়েছি সে কি তুমি জানে না? মিমিদির শরীর ভালো না, মাস দুই-এর জন্য পুরী গেছেন ওঁরা, আমার আপিশ আছে, আমি বাড়িতে রয়েছি, সঙ্গে লোক রয়েছে, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে, রাঙা দিদিমণি?

রাঙা দিদিমণি দূরে দিগন্তের দিকে চেয়ে বলেন,—আমিও একবার স্বাধীন হ'তে চেষ্টা করেছিলাম রে। মিনা তখন তিন বছরের। হঠাৎ মনে হলো এর মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়তে না পারলে বাঁচব না। আমার জীবনটাই ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। যাদের কিছু নেই তাদের জীবন ব্যর্থ হয় না রে, তারা তো যেটুকু আদায় করতে পারে সেটুকুই তাদের লাভ। যাদের সব আছে, যাদের পাবার কিছু বাকি থাকে না, তাদেরই জীবন ব্যর্থ, মল্লিকা। রূপসী ছিলাম, সঙ্গীর অভাব ছিল না। তাদের-ই একজনার সঙ্গে একদিন সন্ধেবেলা আরেকটু হ'লে চ'লে গেছিলাম। সে বলেছিল, আমার একটা কানাকড়িও নেই, এসো, পৃথিবীটা আমাদের। গেছিলাম-ই চ'লে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছি, পেছন-পেছন দেখি একটা ছোট্ট ইজের বগলে নিয়ে মিনাও চলেছে। ব্যস্, যাওয়া হলো না। পেছনকে সঙ্গে নিয়ে তো আর সামনে যাওয়া যায় না, মল্লিকা। হ্যাঁ রে, মাঝে মাঝে তোর দম বন্ধ হ'য়ে আসে না রে?

তারপর কাঁচের মতো চকচকে চোখ দিয়ে মল্লিকার সুগভীর কালো চোখের দিকে চেয়ে বলেন,—না, তোর কিছু নেই, তোর অমন মনে হবে না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন,—তবে রুমার জন্য ভয় করে।

আজ স্বচ্ছ কাঁচের মতো মনে হয় রাঙা দিদিমণির মনটাকে। মল্লিকার একটু একটু ভয় করে, তবে কি তাই হয়? বুক ভরে পেলেও কি তবে মাঝখানটা ফাঁকা থেকে যায়?

মল্লিকাদের আপিশের মেয়েদের ভারী গুণপণা, ওদের মাদ্রাজী বড় সাহেব বলেন, মেয়েদের মতো ভালো কাজ কেউ করে না। ওদের কত আত্মসম্মান, নিজের হাতে ওরা কখনো পেন্‌সিল কাটে না, কাগজ কুড়োয় না, জল গড়িয়ে খায় না, পাখা চালাতে হ'লে সর্বদা ঘণ্টা দিয়ে লোক ডেকে আনে। ওদের ললাটে স্বাধীনতার জয়টিকা সর্বদা চোখে পড়ে। দু'তিনজনা বিয়ে-হওয়া মেয়েও আছে, তারা নিজেদের স্বামীদের পদবী ধরে উল্লেখ করে, আর যে মেয়েরা শুধু ঘরকন্না ছেলেপুলে নিয়ে থাকে, তাদের ভারী ঘৃণা করে। কিন্তু বিয়ে-না-হওয়ারা সর্বদাই কি ক'রে একজন বড়লোক বর জোটানো যায় এই চিন্তায় বিভোর থাকে। ওদের মধ্যে কারো একটা ভালো বিয়ে ঠিক হ'লে ভারী একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে যায়, তবে তার মধ্যে মধুর চাইতে তেতোর ভাগ বেশি। ওরা কাজ ভালোবাসে, বিয়ের পরও চাকরদাসীর হাতে ছেলেপুলের বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে আপিশে আসে। খুব কাজ ভালোবাসে, কিন্তু তার চাইতেও ছুটি বেশি ভালোবাসে। মল্লিকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবে, তাই তো

তা হ'লে পাবার মতো কি রইল দুনিয়াতে?

রাঙা দিদিমণি অস্থির হ'য়ে ওঠেন,—ও মল্লিকা, কেউ আসে না কেন আমার কাছে আজকাল? আমার বিয়ের আগে এত লোক আসত যে বাবা বেজায় রেগে যেতেন। জানিস্, আমাদের সময় সব ফ্যাশানেবল লোকরা সপ্তাহে একদিন ক'রে অ্যাট্ হোম্ থাকত। সেদিন কি ভালোই যে লাগত। জানিস্, এই বাড়িতে বহুস্পতিবার ছিল অ্যাট্ হোমের দিন। পেঁপলিট, কাড্-জু-লাড্‌জোর দোকান থেকে কত রকম খাবার আসত। গেছিস কখনো পেঁপলিটিতে, কাড্-জু-লাড্‌জোর বাড়িতে?

যাবে কি, মল্লিকা সে সবের নামও শোনেনি। রাঙা দিদিমণির চোখের কোণায় জল জমা হয়।—কার সঙ্গে কথা বলা যায়, মল্লিকা? আমার ভালোবাসার জিনিসগুলো কেউ যে আর চেনে না! পেঁপলিট, কাড্-জু-লাড্‌জো কবে উঠে গেছে, এখন মনে পড়ছে। জানিস্, আমাকে নাম ধরে ডাকবে এমন একটি লোক পর্যন্ত নেই পৃথিবীতে। তুই জানিস আমার নাম?

রাঙা দিদিমণির নাম? যতদিন মল্লিকার মনে পড়ে রাঙা দিদিমণিকে কেউ নাম ধরে ডাকেনি, কিন্তু বহুদিন আগে পুরোন একটি ছবির আলবামে মল্লিকা নাম দেখেছিল। বললে,—তোমার নাম সুমনা। ছেলেমানুষের মতো খুশি হ'য়ে ওঠেন রাঙা দিদিমণি।—বুড়ো হবার দুঃখ কি জানিস্, বাইরেটা বুড়িয়ে যায়, ভেতরটা তেমনি থাকে, তেমনি খুঁজে বেড়ায়, তেমনি চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

এমনিধারা কথা বলেন রাঙা দিদিমণি, সবাই বলে ওঁর আর বেশিদিন নেই।

চোদ্দ

একদিনও পলাশের সঙ্গে দেখা হলো না। তা না-ই হলো। মোহনও কোথায় গেছে তার ঠিক নেই। শ্যামলীর বৌদি এসে খবর দিয়ে গেল মোহন নাকি গঙ্গাসাগর যাচ্ছে, কাদের নৌকোর কাজে, কিছুদিন থাকবে সেখানে। ওতে পয়সা আছে।

অমনি মল্লিকা তাকে ধরে পড়ে, কেন আবার কষ্ট ক'রে গঙ্গাসাগর যাবার কি দরকার, এখানে পদ্মকে বিয়ে ক'রে কাঠগুদোমের পার্ট-মালিক হ'য়ে বসুক না। শ্যামলী কোনো কথাই বলে না, অকারণে ছোকরা চাকরটার বাসনধোয়ার খুঁত ধরতে থাকে। মনের জ্বালা বড় জ্বালা।

বৌ ছোটছেলের জন্য বার্লি চাইতে এসেছিল, এমন পেট-রোগা ছেলে যে একটু পুষ্টিকর জিনিস তার ধাতে সইবে না। কি-ই বা পায় দিদি? শ্যামলির দাদা জাত কিপ্‌টে, ওর বাবাও তাই ছিল। না খেতে পেয়ে ছেলে-বৌ শুকিয়ে গেলেও সিন্দুকের চাবি খুলবে না। আমাদের মতো গরীব-দুঃখীর ঘরে সিন্দুক দেখেছ কখনো, দিদি? তিন পুরুষ ধরে না জানি কত কি জমানো আছে ওর মধ্যে, অথচ ঘরের বৌ ছেলে খেতে পায় না। আমার শাশুড়ী মরবার আগে শুকনো চিমড়ে দাঁড় হ'য়ে গেছিল, তবু ঐ মোড়ের মাথার গাঁজিখোর হারাণ কবরেজ ছাড়া কেউ একবার এসে দেখে গেল না। তারপর যখন শ্বাস উঠছে, আমার হাতখানি ধরে বলে,—তোর পায়ে পড়ি বৌমা, একটা ভালো বদ্যি ডাক, যেমন ক'রে পারিস। ছোট ছেলেটা মানুষ হয়নি। তবু টাকা দিল না বুড়ো। আমি গিয়ে ব'লে-কয়ে জগাই ওঝাকে ডেকে আনলাম, কি সব ঝাড়ফুঁকও করলে সে, তা প্রাণবায়ুটা শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে গেল। সে ছেলেটাও মানুষ হয়নি, দেখেছ হয় তো? ভাঙটাঙ খায়, জুয়ো খেলে দিন কাটায়। শ্যামলির

দাদা নিজের মায়ের পেটের ভাইকে ঘরে ঢুকতে দেয় না।

বৌ খানিক চুপ ক'রে থেকে আবার বলে,—একদিন যেমন ক'রে পারি, ভাঙব ঐ সিন্দুকটাকে। ছোট দেওরটা মাঝে মাঝে এসে শাসায়, ওর অর্ধেক ভাগ তো তারই। ওটি ভাঙলে আর কারু কোনো দুঃখ থাকবে না।

মল্লিকা বলে,—কি যে বলিস, বৌ, কি-ই বা থাকতে পারে ঐ সিন্দুকে। কোত্থেকে পাবে টাকা শ্যামলীর বাপ-ঠাকুরদারা যে সিন্দুক ভরে রাখবে?

—কি জানি, দিদি, ভালোভাবে সিন্দুক ভরানো যায় না সত্যি। তবে আগে তো শুনেছি এদিকে ডাকাতি-টাকাতি খুবই হতো; অথচ ধরা তো পড়োনি কেউ।

এবার শ্যামলী যোগ না দিয়ে পারে না।—কি বলতে চাও, বৌদি, খোলাখুলি বল না কেন? আমার বাপ-ঠাকুরদা ডাকাত ছিল, এই তো?

বৌ জিভ কেটে, তাঁদের উদ্দেশ্যে হাত তুলে কপালে ঠেকায়,—ওমা! ছিঃ, না! এই পাঁচজনে বলাবলি করে তাই বললাম আর কি! আর খালিই যদি হবে তো অত তেল-সিঁদুর দিয়ে পুজো করাই বা কেন? তোর ওষুধের খরচ দিতে তোর গয়নাগুলো শেষটা বাঁধা দিতে হলো। সে কি আর ছাড়াতে পারবি কোনো দিন?

মল্লিকার আপিশের দেরী হ'য়ে যাচ্ছে, তার আর বসে বসে গল্প শুনবার সময় নেই, উঠে পড়তে হয়। বৌও ছেলে কোলে উঠে পড়ে, বলে,—সত্যি কথা বলতে কি, দিদি, পয়সার দুঃখের মতো দুঃখ দুনিয়াতে আর নেই।

ওর কথাগুলো সারাদিন মল্লিকার কানে বাজতে থাকে। শরীরটাও দুদিন থেকে কেমন ভালো যাচ্ছে না। সেদিনও মিনামাসিমা ওকে আনতে পাঠিয়েছিলেন, গাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে মল্লিকা সকাল সকাল বাড়ি আসে। শ্যামলী বারান্দার রেলিং ধরে গঙ্গার দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, চারিদিক অন্ধকার ক'রে বৃষ্টি এল বলে। ওর মন-খারাপের হাওয়া এসে মল্লিকার মনেও লাগে। সে একটু ঝাঁঝালো সুরে বলে,—ফের মোহনের জন্য মন খারাপ কচ্ছিস্, শ্যামলী? কি পাস ওর কাছ থেকে? অনাদর ছাড়া কি দেয় তোকে?

শ্যামলী বলে,—বয়ে গেছে, দিদি। ভাবছিলাম, বৌদিদির কথা। কাঁচের চুড়ি ছাড়া বৌদিদি কখনো গয়না পরেনি। যাই, চা ক'রে আনি।

মিনামাসিমা চাকরবাকরদের সঙ্গে বেশি দহরম-মহরম পছন্দ করেন না। আগে রাঙা দিদিমণিও করতেন না, কিন্তু আজকাল ঐ চতুরা সুন্দরীটিই হয়েছে ওঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। একটা কাউকে মনের কথা না বলে কেমন ক'রে থাকি, বল্ রে মল্লিকা? তুই যদি আমার কাছে থাকিস, তবে আর সুন্দরীকে বলতে হয় না। তা ছাড়া ও তো মিনার মাইনে-করা স্পাই, এ ঘরের প্রত্যেকটি কথা গিয়ে রিপোর্ট করে, সে কি আর আমি জানি না।

এইখানে সুন্দরী রেগেমেগে হাতের চিরুণী নামিয়ে রেখে দুম্‌দাম্ ক'রে নিচে চলে যায়। মল্লিকা ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে,—ও রাঙাদি, ওর সামনে বলো কেন? ওর মনে কষ্ট লাগে না?

—সত্যি কথা শুনলে আবার মনের কষ্ট কি রে? তা একটু লাগলেও, মিনা ওর জন্য কানের সোনার টপ্ গড়িয়ে রেখেছে, এখুনি সব দুঃখ ভুলে যাবে।

খানিক কি ভেবে আবার বলেন,—বুঝলি, আমার উপর টিকটিকিগিরি করবার জন্য, আমার টাকা দিয়ে ওর জন্য সোনার টপ্ গড়িয়েছে! কেমন মজা না? রাঙা দিদিমণি সত্যি ভারী কৌতুক বোধ করেন।

—সুন্দরী কিন্তু আমার ভারী যত্ন করে মল্লিকা। ওর স্বামী আরেকটা মেয়েমানুষ রেখেছে বলে রাগ করে ও চাকরি করতে বেরিয়েছে, নইলে ওদের অবস্থা ভালোই ছিল, ওর স্বামী মোটরগাড়ির মিস্ত্রী। সে মেয়েটা আবার সুন্দরীর চেয়ে অনেক কালো কুৎসিত, তবু তাকেই বেশি ভালোবাসে।

মল্লিকা বিস্মিত হয়।—কেন, তাকে বেশি ভালোবাসে কেন?

—আরে খাসা রাঁধে যে, আর মুখ ভারী মিষ্টি। পুরুষ মানুষরা আর কি চায়! বুঝলি প্রথমটা খুব রাগ ছিল সুন্দরীর, ওদের নাম করলেও রেগে যেত, এখন মাঝে মাঝে যায় সেখানে। ঐ মেয়েমানুষটার একটা পাঁচ বছরের ছেলে আছে, জানিস তার জন্য এটা-ওটা নিয়ে যায়। তারা নাকি ভারী যত্ন করে ওর।

গঙ্গার দিকে চেয়ে চেয়ে মল্লিকা ভাবে, সত্যি তো, তবে শেষ পর্যন্ত কি থাকে হাতে? ভালোবাসাগুলোও না, শত্রুতাগুলোও না।

চা দিতে শ্যামলীর দেরী হ'য়ে যায়। মোহন এসে রান্নাঘরের সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে খুব খানিকটা ঝগড়া করে। গঙ্গাসাগরে যাবার কথা উল্লেখ করে না সে, দেমাক দেখিয়ে রোগা শরীরে কাজ করতে আসা নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। শ্যামলী সত্যি রেগে ওঠে। ওঃ, কত আমার দরদ যে, অসুখের সময়ই টের পাওয়া গেছিল!

মোহন কথা ঘুরিয়ে বলে,—গয়না বাঁধা দেবার কি দরকার ছিল? ঐ তো রূপ, গয়না না পরলে তাকানো যায়!

—তবে দেখো না, যাও। কে এখানে আসতে বলেছে। যাও, আমার কাজ আছে।

—যাচ্ছি, এই নাও ধরো।

মোহন সিঁড়ির মাথায় গয়নাগুলো রেখে দিয়ে ঝড়ের মতো চলে যায়, শ্যামলী সেদিকে চেয়ে থাকে, কণ্ঠার কাছে একটা শিরা ধুকধুক করতে থাকে। মল্লিকা সেই শিরাটা থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। সে যে কখন এসে দাঁড়িয়েছে ওরা দু'জনে লক্ষ্য করেনি।

বাড়ির সামনে দু'টো গাড়ি দাঁড়ায়, এক ঝাঁক পাখির মতো মোমো, টিঁলি, রিনা, মলি, ডলি, রুমা, সুকোমল, পলাশ, অনুরাধা, এমন কি অনুরাধার স্বামী পর্যন্ত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসে।

—ডার্লিং, তোমার মন ভালো ক'রে দিতে এলাম। তোমার শরীর খারাপ হ'লে তো চলবে না। দেখ, রুমা শেষটা সত্যি সত্যি পলাশকে বাগিয়ে নেবে। তুমি একটু বুদ্ধি না দিলে হবে না, আমাদের যা করবার সব করেছি। দিনরাত রুমার নিন্দে করি, রুমার দিদিমার নিন্দে করি। কিন্তু কিছুতে কিছু হয় না। ডার্লিং, কি মিষ্টি পুরোন বাড়ি, নিশ্চয় হণ্টেড্? উ-উ! গঙ্গার ধারের সরু পথটাকে দেখ, চাঁদনী রাতে জল থেকে কি সব যদি উঠে না আসে তো কি বলেছি!

ওরা বাড়িময় ঘুরে বেড়ায়, দেয়ালে ঝোলানো পুরোন জাপানী প্রিণ্টগুলোর তারিফ করে, ঘরের কোণে গোল জাপানী আলোর তারিফ করে, যা দেখে তাই ওদের ভালো লাগে। গাড়ি থেকে কার্ডবোর্ডের বাক্স নামিয়ে আনে, ফ্লাস্ক-ভরা গরম কফি নামিয়ে আনে, সারা সন্ধ্যাটা হেসে গল্প ক'রে রাত নটার পর বিদায় নেয়।

—সব তোমার চালাকি! কিছু অসুখ করেনি তোমার, কেবল আমাদের এড়িয়ে যাবার ফন্দি! ও সব চলবে না!

রুমা সহজে কাকেও আদর করে না, আজ সে-ও মল্লিকার গালে একটা চুমো খেয়ে দিলে।—যেও মল্লিকা, এমন তো কখনো করো না। তোমার চেহারা খারাপ হ'য়ে গেছে। এরকম করো না। অত একা থাকা ভালো না। আচ্ছা, সুকোমল, তোমার হাতে তো দেদার সময় থাকে, এক আধবার খোঁজ নাও না কেন?

সুকোমল জিভ কেটে বলে,—ও যে আমাকে কি বলে ইয়ে সে রকম লাইক করে না।

পলাশ আলাদা ক'রে কিছু বলে না। শেষ পর্যন্ত মল্লিকা একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে,—আমাদের বাড়ির খবরও কি একবার জিজ্ঞাসা করতে হয় না?

পলাশ বললে,—সে আমার মামিদের চিঠিতে পাই। তুমিই বরং সেখানকার সঙ্গে যোগ রাখতে চাও না শুনতে পাই।

এ কথার কোনো উত্তর হয় না, কি বলবে মল্লিকা।

ওরা গেলে মল্লিকা ডেকে বললে,—শ্যামলী, আমার ক্ষিদে নেই, তোরা খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়।

আর শ্যামলী বললে,—ছেলেটা খেয়ে বাড়ি চলে গেছে। আমার বুক ধড়ফড় করছে, আমিও খাব না, দিদি।

জ্বালা কিছুতেই জুড়োয় না।

পনেরো

পম্পা চক্রবর্তী গুরুদেবের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে অষ্ট প্রহরব্যাপী কীর্তনের ব্যবস্থা করেছেন, তারপর কীর্তনান্তে সকলকে একসঙ্গে ভোজনে নেমন্তন্ন করেছেন। বন্ধুবান্ধব সকলকে বলেছেন, তাদের বন্ধুবান্ধবকেও বলেছেন। এমন কি পলাশের বন্ধু শম্ভু সরকারকেও বলেছেন, কারণ নেচারোপ্যাথি ক'রে সে গুরুদেবের হাঁটুর ব্যথা সারিয়ে দিয়েছে, গুরুদেব ভারী কৃতজ্ঞ বোধ করছেন। বাদ পড়েছে শুধু বিপাশা।

তাই নিয়ে বন্ধুমহলে বেশ খানিকটা আন্দোলনের সৃষ্টি হলো। বিপাশা নাকি মেয়ে ভালো না ব'লে লেডি চক্রবর্তী ওকে নেমন্তন্ন করেননি। মিনামাসিমাও বললেন,—তা সমাজের কোনো নিয়মকানুন সে মানবে না, সমাজই বা তাকে স্থান দেবে কেন? মোমো টিলির দল বিপাশার উপর হাড়ে চটা হ'লেও দারুণ একটা আন্দোলন শুরু ক'রে দিল, তা হ'লে আমাদের দলেরও কেউ যাবে না। কি বা নিখুঁত পম্পা চক্রবর্তীর জীবনের ইতিহাস যে বিপাশার সে দোষ ধরে!! তার নিজের প্রাইভেট লাইফ্-এ বিপাশা কি করে না করে, তাতে পম্পা চক্রবর্তীর কি যায় আসে, তার সঙ্গে তো আর খারাপ ব্যবহার করেনি কখনো!

টিলি বললে,—সে বরং আমরা বলতে পারি। কম পাজি ঐ মেয়ে, কারো যদি একটা ছেলে-বন্ধু জুটেছে তো যেমনি ক'রে পারে, ছিপ ফেলে কি আঁকশি দিয়ে, নিদেন দড়ির ফাঁস পরিয়ে অমনি বাগিয়ে নেবে! কম জ্বালিয়েছে আমাদের চিরটাকাল! অথচ নিজের দুটো দুটো স্বামীকে—

মোমো বললে,—দ্বিতীয়টাকেও স্বামী বলছ কেন ভাই—

মিলি বললে,—এখন পর্যন্ত কার কার কাছ থেকে টাকা নেয় আর ওদিকে ঐ লোকটার সঙ্গে—

রুমা কারো নিন্দে করে না। পলাশকে বললে,—তোমার বন্ধুদের কথা হচ্ছে যে, ওদের

ডিফেণ্ড করবে না?

পলাশ হেসে বলে—বিপাশাকে কেউ ডিফেণ্ড করতে গেলে সে যে অপমান বোধ করে। আর শম্ভুটার সারা গায়ে আর্মাডিলোর মতো বর্ম আঁটা, তাকে ডিফেণ্ড করার কোনো মানেই হয় না।

আহত হ'য়ে টিলি বললে,—বাঃ! আমরা বিপাশার পক্ষ নিয়ে আন্দোলন করছি, আমরাও কেউ যাব না বলছি—

পলাশ বললে,—কেন যাবে না? তার বাড়িতে তার যাকে খুশি বলবে, যাকে খুশি বাদ দেবে। বাইরের লোকের কিছু বলবার অধিকার থাকতে পারে না।

সকলে অবাক হয়।—সে কি পলাশ, তাই ব'লে আমাদের বন্ধুদের একজনকে এ ভাবে অপমান করবে—অপমানই তো পলাশ,—ওকে না বলা মানেই যে ওঁদের মতে ও ওঁদের সঙ্গে মেশবার অযোগ্য—আর আমরা চুপ ক'রে বসে থাকব? আমাদেরও তো একটা সামাজিক কর্তব্য আছে।

পলাশ বুঝতেই পারে না এর মধ্যে আবার সামাজিক কর্তব্য কোথায়! এরা সব অতিশয় প্রগতিশীলা; হিন্দুধর্মকে এরা একটা বিরাট কুসংস্কার মনে করে, গুরু করা শুনলে নাক সিঁটকোয়, যদিও এই গুরুদেবটির যে দারুণ একটা পার্সোন্যালিটি আছে সে কথা অস্বীকার করে না কেউ, পম্পা চক্রবর্তী যে একটা যা' তা' ধরে নিয়ে আসবে না সে আর কে না জানে। কম অহংকারী ঐ মেয়ে! কখনো কারো উপর অন্যায় ব্যবহার করতে চায় না, পাছে লোকে দোষ ধরার সুযোগ পায়। চালের ওর অন্ত আছে! সে যাই হোকগে, এখন প্রশ্ন হলো সেখানে যাওয়া হবে, কি হবে না।

মিনামাসিমা উঠে দাঁড়িয়ে শাড়ির আঁচল টেনে গায়ে জড়িয়ে বললেন,—তোমাদের সামাজিক কর্তব্যজ্ঞান গুলিয়ে গেছে, টিলি। রুমা, ওঠো। পলাশ, তুমিও আসবে নাকি? মার শরীর মোটে ভালো যাচ্ছে না, মল্লিকাকে বসিয়ে রেখে এসেছি।

পলাশ আশ্চর্য হয়।—মল্লিকা এসেছে? চলুন, দেখা যাক, সে কি বলে।

টিলিরাও উঠে পড়ে।—রুমা, লুক আউট! ঈডেনে সাপ ঢুকলো না তো? তবে মল্লিকাটা একটা ইডিয়ট, একটু চেষ্টাও করে না।

মিনামাসিমা এ ধরনের কথাবার্তা পছন্দ করেন না। বিরক্ত হ'য়ে বলেন,—তোমাদের কথাবার্তার কি ছিরি, টিলি? মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐ একটা সম্বন্ধ ছাড়া আর কিছু কি ভাবতেও পার না?

টিলিরা খুব হাসে,—চোখে তো কখনো পড়ে না, মিনামাসিমা, অন্য কোনো সম্বন্ধ। তা'হলে নেমন্তন্নে যাওয়াই ঠিক হলো?

রাঙা দিদিমণির বারান্দায় চাঁদের হাট বসেছে, বিপাশা, মল্লিকা, সুকোমল, আরো দু'চারজনা এসে জুটেছে। মল্লিকা ছাড়া বাকি সবাই এসেছিল রুমার খোঁজে, সে নেই শুনে চলে যাবার উপক্রম করেছিল, কিন্তু রাঙা দিদিমণি সুন্দরীকে পাঠিয়ে তাদের ধরে এনেছেন।

মিনামাসিমাদের দেখে সকলে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল।—দু'ঘণ্টা ধরে আমাদের সেসন্ চলেছে, মাসিমা, রাঙা দিদিমণি যে কি না বলছেন, তার ঠিক নেই।

মিনামাসিমা হস্ত-দৃষ্টিতে মা'র দিকে তাকান। একটা অশিষ্ট ছোট মেয়ের সঙ্গে আজকাল মা'র কেমন সাদৃশ্য লাগে। রাঙা দিদিমণি মাথার একটা ঝাঁকি দিয়ে বললেন,—

তোমার কোনো ভয় নেই মিনা, কোনো গোপনীয় পারিবারিক কথা বলিনি। বাবার মেমেদের কথা তো এরা সবাই জানেই। জানো, রবিঠাকুরের উপর বাবার দারুণ রাগ ছিল। তাঁর পুরো নামটা পর্যন্ত মুখে আনতেন না, বলতেন 'দ্যাট টেগোর ফেলো', কিম্বা 'দ্যাট বিয়ার্ডেড ব্লোক্', ওর হাতে পড়ে দেশটা উচ্ছন্ন যাচ্ছে।' মাঝে মাঝে ড্রেসিং গাউন পরে, রবিঠাকুর সেজে, ঠোঁট বেঁকিয়ে কি সব কবিতা আওড়াতেন, সবাই হেসে কুটোপাটি হতো।—এ সব গল্পে কোন দোষ আছে, মিনা?'

মিনামাসিমা শুষ্ক কণ্ঠে বললেন,—না, তা নেই হয়তো। কিন্তু মারা যাবার আগে তিনি ঐ রবিঠাকুরের 'নৈবেদ্য' কোলে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন।

রাঙা দিদিমণি হেসে বলেন,—রবিঠাকুরকে কেউ ঠাট্টা করলে মিনার আঁতে ঘা লাগে। ওদের সময়কার মেয়েরা সব রবিঠাকুরের পুজো করত। ও এখনো 'প্লান' বলে না, বলে 'প্লানো'; নইলে 'আনো'র সঙ্গে মিলবে না যে!

মিনামাসিমা উঠে যান। মল্লিকা বলে,—যাই, রাঙা দিদিমণি, আমিও চলি, অনেক দূরে যেতে হবে।

সিঁড়ির মাথায় পৌঁছলে, পলাশ পিছু ডাকে,—মল্লিকা।

মল্লিকা থমকে দাঁড়ায়; খোলা জানলা দিয়ে বাগানের কি একটা পুরানো লতাগাছের শাদা ফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসে।

মল্লিকা বললে,—কি?

পলাশ কথা খুঁজে পায় না। বলে,—একা যাবে এতদূর?

মল্লিকা হেসে বললে,—কোথায় সঙ্গী পাব, বলো?

পলাশ বললে,—আমি যাব?

—না।

—না কেন?

—স্বাধীন মেয়েদের সঙ্গী দরকার হয় না।

পলাশ মল্লিকার হাতের কব্জী ধরে বলে,—বেশি স্বাধীনতা ভালো নয়, মল্লিকা।

রুমা উপর থেকে বলে,—মল্লিকা, গেলে? মা ড্রাইভারকে ব'লে রেখেছেন পৌঁছে দেবে।

পলাশ মল্লিকার হাত ছেড়ে দেয়।

রুমা নেমে এসে বলে,—চলো না পলাশ, আমরাও ঘুরে আসি।

পলাশ বললে,—না থাক। ওর মেজাজ ভালো নেই।

মল্লিকা বললে,—না রুমা, মিছিমিছি এসো না তোমরা।

ষোল

পলাশের ভারী আশ্চর্য লাগে দেখে যে নেমন্তন্ন না হওয়াতে বিপাশাও বড় ক্ষুণ্ণ হয়েছে।—তাই বা কেন হবে বিপাশা? তুমি তোমার ইচ্ছেমতো চলে থাকো, ওঁদের জিজ্ঞাসা করো না। ওঁরাই বা কেন তাঁদের ইচ্ছেমতো চলবেন না?'

শম্ভুও বললে,—রাইট। তুমি সমাজকে আগে কাঁচকলা দেখিয়েছ, এখন রাগ করলে চলবে কেন?

বিপাশা রেগে বলে,—তোমরা যদি দু'নৌকোয় পা দাও তাহ'লে আর আমার কিছু বলবার থাকে না। জানো, পদে পদে আমাকে একশো রকম ছোট ছোট অপমান সইতে হয়?

—কি আবার অপমান সইতে হয়? টিলিরা তো তোমার পক্ষ নিয়ে মহা আন্দোলন করেছিল।

—কিন্তু যাচ্ছে তো সবাই সেখানে। অনুরাধা নতুন শাদা কাতান্ শাড়ি কিনেছে। আমাদের বাড়ি গিয়ে জলতেষ্টা পাবার ছল ক'রে দেখিয়ে আনল। কি তোমাদের নিখুঁত চরিত্র ঐ অনুরাধার! স্বামীর সঙ্গে বাস করলেই আর কেউ সতী হয় না! সবাই জানে অনুরাধার কথা! তাহ'লে ওর কেন নেমন্তন্ন হলো?

শম্ভু চেয়ার টেনে কাছে এসে বসলো। তর্ক করতে পারলে সে আর কিছু চায় না। উৎসাহের চোটে নিজের দাঁত ব্যথার কথা পর্যন্ত সে ভুলে গেল।

—কি মুস্কিল, বিপাশা! আচ্ছা, মেয়েরা কেন ভালো তর্ক করতে পারে না বলতো। তোমার মতো একটা সাহসী বুদ্ধিমতী মেয়েও এমন এলোপাতাড়ি তর্ক করে কেন বলতো?

পলাশ বললে,—আরে তার একমাত্র কারণ যে ওরা কোনো কথার সংজ্ঞা বোঝে না। ওদের তর্ক করা মানেই খানিকটা মনের ঝাল ঝাড়া।

—কিসের সংজ্ঞা বুঝি না? বাজে বকছ!

—এই যেমন ধর, সামাজিক মোর‍্যালিটি আর ব্যক্তিগত মোর‍্যালিটি তুমি গুলিয়ে ফেলেছ!

—সে আবার কি? যেটা মন্দ সেটা সর্বদাই মন্দ। তার আবার সামাজিক ব্যক্তিগত কি!

শম্ভু ভারী খুশি হ'য়ে বললে,—ঠিক বলেছ, পলাশ, ওরা কথার মানে বোঝে না। আরে, অনুরাধা তার প্রাইভেট লাইফে কি করে না করে, তাই দিয়ে তোমাদের মাথাব্যথা? ওর সামাজিক জীবনে ও মোটামুটি সব আইন মেনে চলেছে, কাজেই সমাজে ওর একটা স্থান আছে।

বিপাশা উঠে দাঁড়ায়।—কোনো দিনও এ দেশের উন্নতি হবে না! অর্থাৎ তোমরা বলতে চাও ভেতরে ভেতরে যাই থাকুক না কেন, বাইরের পাঁচজনের সঙ্গে মানিয়ে চললেই হলো, এই তো! কাজ নেই আমার অমন মোর‍্যালিটিতে! এই বেশ আছি।

পলাশ বললে,—ঠিক বলেছ, তবে আর নেমন্তন্ন করেনি ব'লে দুঃখ করছ কেন? না করল, না করল।

বিপাশা মাথা নাড়ে,—না, তাহ'লে আমার জীবনে আর রইল কি?

বিপাশা কিছুতেই বোঝে না যে ও সমাজকে ছাড়লে সমাজও ওকে ছেড়ে দেবে। এমন মেয়ের সঙ্গে কি ক'রে তর্ক চলে?

পলাশের মায়া লাগে।—তুমি কি ওদের এতই ভালোবাসো বিপাশা, যে ওদের নইলে তোমার চলবেই না?

—ভালোবাসি ওদের? দেখতে পারি না প্রত্যেকটাকে! ঐ তোমাদের মিনামাসিমাটিকে দেখ! পঞ্চান্ন বছরের উপর বয়স হলো, স্বামীটিকে সারা জীবন অমন হাড় জ্বালালো, এখন উনিই হোলেন সকলের পরামর্শদাত্রী! আর লেডি চক্রবর্তী নিজে কি! আমার দোষ ধরতে ওদের লজ্জা করে না।

বিপাশা কেঁদে আকুল হয়। পলাশ ভেবে পায় না ওর কিসের জন্য এত দুঃখ। ও তো নিঃসঙ্গ নয়। সমাজের গায়ে লাগা আরেকটা অতি-আধুনিক সমাজ যে আছে, সেখানে তো

বিপাশার প্রবল প্রতিপত্তি। কত বিদেশের খ্যাতিমান লোকে বিপাশার মনের জোরের আর উদার মতামতের কত প্রশংসা ক'রে থাকে, এসব তো বিপাশার নিজের মুখ থেকেই অনেকবার শোনা গেছে। কিন্তু সে কথা উত্থাপন করতেই বিপাশা বলে, সমাজে জায়গা হবে না, সমাজের গায়ের ফোস্কা দিয়ে মন ভুলোতে হবে।

শম্ভু একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে,—বললাম পলাশ, ওদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা! বিপাশা আসলে দারুণ প্রাচীনপন্থী, যাকে বলে কন্‌ভেন্‌শনেল্‌। ঝোঁকের মাথায় কতক-গুলো কাজ ক'রে ফেলেছে, এখন তার কোনো একটা নাথি দেখাতে পারছে না ব'লে রেগে আগুন হচ্ছে। উঃ, দাঁতব্যথায় গেলুম!

বিপাশা হৃদয়হীনভাবে বললে,—আরো নেচারোপ্যাথি করো।

পলাশ বললে,—ব্যথা জিনিসটাই স্বাভাবিক অবস্থার জিনিস নয়। শিকড় বাকল না খেয়ে বরং একটা দাঁতের ডাক্তারের কাছে গিয়ে ওটিকে উপড়ে ফেল। নেচারোপ্যাথির কোনো স্কোপ-ই নেই এখানে।

বিপাশার আরো কান্না পায়।—ঐ দেখ, তোমাদের ব্যবহারের মধ্যেও কোনো মোর‍্যালিটি নেই, নিজেদের সুখ-সুবিধার জন্য যখন যেটা দরকার তাই কর। শম্ভু যদি আবার নেচারোপ্যাথির কথা মুখে আনে আমি ওর মুখ দেখব না।

সত্যি বিপাশাকে নিয়ে কি করা যায়!

লেডি চক্রবর্তীর বাড়িতে মোমো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সব কথা পলাশের কাছ থেকে বের করলো।—কিন্তু তাহ'লে শম্ভু এলো না কেন?

টিলি বললে,—ঈশ্‌! বিকেলটাই মাটি! ওকে দেখব ব'লে কবে থেকে আশা ক'রে আছি। কেন, এলো না কেন?

পলাশ বুঝিয়ে বলে, ওর এমনি দাঁতব্যথা হয়েছে যে আর আসতে পারেনি।

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। বিপাশা রাগ ক'রে বাড়ি চলে যাবার পর শম্ভু শেষ পর্যন্ত পলাশের সঙ্গে গিয়ে দাঁতটা তুলিয়েই এল। ফিরে এসে দু'জনায় বেরুবার জন্য তৈরীও হয়েছিল। সদর দরজার কাছে এসে শম্ভু বললে,—তুমি যাও, পলাশ, যা হয় বুঝিয়ে বল।

—কেন, তোমার দাঁতব্যথা সারেনি?

শম্ভু বললে,—সেরেছে।

পলাশ শম্ভুর চোখের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে হেসে বললে,—ঠিক আছে, শম্ভু।

পলাশ ট্যাক্সিতে চড়ল, শম্ভু উল্টোমুখো ট্রাম ধরে বিপাশাদের বাড়ির দিকে চলে গেল।

আসল কথাটা রুমার কাছে ভেঙে বলতে হলো, রুমার কাছে মিথ্যা কথা বলা চলে না। রুমার চোখের তারাতে একটু সোনালি আভা লাগে, চোখের শাদা অংশটিতে নীল রঙের ছোঁয়া লাগে, তার ধারে ধারে গভীর কালো। রুমার কাছে মিথ্যা কথা বলা বড়ই শক্ত।

রুমা যেন ভারী খুশি হ'য়ে উঠল। ওর শ্বেতপাথরে গড়া সৌন্দর্যে খানিকটা কোমলতা দেখা দিল।—মল্লিকা কেন আসেনি পলাশ?

—কি জানি, তার সঙ্গে তোমাদের বাড়িতেই শেষ দেখা।

—আসবে নিশ্চয়, কথা যখন দিয়েছে। মল্লিকা কখনো কথা ভাঙে না, তা জানতে,

পলাশ?

এ গুণের পলাশ প্রশংসা করতে পারে না।—কথা না ভাঙাটা কি খুব বড় কথা হলো? কথা দেবার সময় যেমন পরিস্থিতি ছিল, পরে তো তা পালটে যেতেও পারে; তবু কথার নড়চড় হবে না, এ কি খুব বুদ্ধির কথা হলো? কথা না ভাঙে যদি তাহ'লে মল্লিকাটা একটা ইডিয়ট।

—মল্লিকাটা একটা ইডিয়ট! বাঃ, কি সুন্দর কথা তোমার।

রুমা খুশি হ'য়ে ওঠে।

—কখন এলে মল্লিকা? কেমন আছ তুমি?

মল্লিকা আজ নতুন হলুদ রঙের শাড়ি পরেছে, আনন্দে ঝলমল করছে, চোখে মুখে কথা বলছে। মল্লিকার বহুদিনের পুরানো অনেকগুলি কথা পলাশের মনে পড়ে যাচ্ছে।

—সত্যি ক'রে বল, মল্লিকা, একটা কিছু হয়েছে কি না?

—কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, কি আবার হবে!

কোনো রাগ-অভিমানের চিহ্নমাত্র নেই, মল্লিকার মনের মধ্যে একটা হাশি-খুশির স্রোত বয়ে যাচ্ছে। পলাশের ভালো লাগে না। মল্লিকা ওকে এড়িয়ে যায়, শুধু এই ফুলে-ভরা লম্বা ঘরখানির ব্যবধান নয়, দু'জনার মাঝখানে লক্ষ যোজনব্যাপী ব্যবধান পলাশ আজ প্রথম অনুভব করে।

মনের ক্ষোভে গিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে তুমুল তর্ক ক'রে এল। গুরুদেব রেশমি গেরুয়া প'রে, তাও ঠিক গেরুয়া বলা যায় না, কাঁচা সোনার মতো রঙটি, রেশমি সুতোর কাজ-করা শাদা বিদ্যাসাগরী চটি পায়ে দিয়ে, মেহগেনির তক্তপোষে পাতা নীল মখমলের ফরাসের উপর বসে ছিলেন। পলাশের কথায় বিন্দুমাত্র রাগ করলেন না গুরুদেব, বরং স্মিত হেসে বললেন,—তুমি গোড়া থেকেই ভুল করেছ বেটা, ধর্ম কথা বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করতে হয় না, বিশ্বাস দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। তোমার বুদ্ধির নিন্দা করছি না, তবে যে পথে যেখানে যেতে হয়। দার্জিলিং যাব ব'লে মাদ্রাজের গাড়িতে চেপে বসলে হবে না।

গুরুদেব একটু রেগে গেলে পলাশের ভালো লাগতো। সে বললে,—তাহ'লে আপনার ধর্মতত্ত্ব বুদ্ধির কাছে দাঁড়াতে পারে না, বলুন।

—না, তা কেন? নক্ষত্র দেখতে হ'লে চোখে দূরবীণ লাগাতে হয়, মাইক্রোস্কোপ দিয়ে তো আর চলে না। কি বল মা?

গুরুদেব পাশে বসা রূপসী মেয়েটির দিকে তাকান। পলাশের হাড় জ্বলে যায়। ভারী সুন্দর মেয়েটি, ভারী সৌখীন বেশবাস, ভক্তিতে গলে গিয়ে গুরুদেবের দিকে চেয়ে আছে। বয়সে গুরুদেবের চেয়ে বড় বই ছোট হবে না। গুরুদেব সবাইকে 'তুমি' বলেন, তবে সমান স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন কিনা সন্দেহ। এ বিষয়ে ভগবানের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়, কাউকে হয়তো গলা থেকে সোনার হার খুলে অকারণে দান ক'রে বসলেন, আবার কারো দিকে ভালো ক'রে চাইলেন না পর্যন্ত। ভক্তদের হৃদয় তোলপাড় হ'য়ে যায়, গুরুদেবের অহৈতুকী কৃপার তারা কোনো মানে খুঁজে পায় না, গুরুদেবকে কোনোভাবে দোষী করবার কথা মনেও আনে না, কেবল পরস্পরের ঈর্ষায় জ্বলে যায়।

দলে দলে ফ্যাশানেব্‌ল্‌ প্রৌঢ়ারা গুরুদেবের পায়ের ধুলো নেন। সোনালি রুপোলি হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে লেডি চক্রবর্তীর হাতে গুরুদেবের জন্য প্রণামী দিয়ে যান, সরাসরি তাঁর হাতে তুলে দিতে লজ্জা করে। শুধু যে সব কম বয়সী মেয়েরা রঙিন গরদের জোড় কিংবা

রুপোর পানের ডিবে কিংবা স্যাটিনের বালিশ এনেছে, তারা আদর করে গুরুদেবের হাতে সে-সব তুলে দেয় আর গুরুদেবের হাত থেকে ফুলের মালা নিয়ে খোঁপায় জড়িয়ে রাখে।

ঢং দেখে পলাশের গা জ্বলে যায়। ও পাশের আধাবয়সী সৌখিন মহিলাটি তাঁর ওপাশের অপরা আধাবয়সী সৌখিন মহিলার কাছ থেকে বেনারসিওয়ালার ঠিকানাটি খুদে নোটবই-এ টুকে, নোটবইটি হ্যাণ্ডব্যাগে ভরে, নিজের হাতের নখের পালিশ পর্যবেক্ষণ করেন। তারপর গভীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, সুর্মা-আঁকা দুটোখ দিয়ে পলাশের দিকে বিলোল কটাক্ষ ক'রে বললেন,—কি জানো ভাই, এক একটা সময় আসে যখন জীবনটাকে একেবারে ফাঁকা-ফাঁকা মনে হয়, ক'দিন আর এইসব পার্থিব জিনিস নিয়ে থাকা যায়, তখন ছুটে এসে একবার গুরুদেবের পায়ের ধুলো নিয়ে যাই, প্রাণটা জুড়িয়ে যায়। তাই নয় গুরুদেব?

ছেলের বয়সী গুরুদেবের দিকে ভদ্রমহিলা তেমনি ক'রেই চেয়ে থাকেন। গুরুদেব বলেন,—নিশ্চয়, বেটি, নিশ্চয়, আমার দরজা সর্বদাই খোলা থাকে।

পলাশের মন অন্যদিকে চলে যায়। পলাশ জানে এসব কটাক্ষেরও কোনো মানে নেই, পুরুষ জাতীয় কেউ কাছে এলেই, আপনা থেকেই এদের চোখগুলি ঐরকম হ'য়ে যায়, তাতে আশান্বিত হবারও যেমন কিছু নেই, শঙ্কিত হবারও কারণ নেই।

মামিমাদের কথা মনে পড়ে। শুধু পালা-পার্বনে নয়, মাঝে মাঝে খবর না দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ পলাশের মামাবাড়িতে দিদিমার গুরুদেবের আগমন হয়। অমনি বাড়িতে ঠাকুরপুজো লেগে যায়, মামিরা রেষারেষি ক'রে ঠাকুরসেবা লাগিয়ে দেন। পাড়া থেকে দলে দলে মেয়ে এসে জোটে। যার যা সমস্যা আছে, গুরুদেবের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়, যে যা পারে প্রণামী দিয়ে যায়। খাটো তসরের ধুতি পরেন গুরুদেব, পায়ে কাঠের খড়ম, গায়ে এণ্ডির চাদর, মাথা মুড়োনো। বিপদে-আপদে বাড়িতে একবার গুরুদেবের পায়ের ধুলো পড়লে সবাই যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

পলাশ অন্যমনস্ক হ'য়ে যায়। সত্যিই মামিমারা নিশ্চিন্ত বোধ করেন, যেখানে কোনো অবলম্বন ছিল না, সেখানেও যেন একটা অবলম্বন খুঁজে পান। ডাক্তার যেখানে আশা দিচ্ছেন না, গুরুদেবের মুখ চেয়ে পলাশের মুখ্যু মামিমারা সেখানেও বুকের মধ্যে আশা পুষে রাখেন। এঁরাও হয়তো তাই।

যদিও তারা কেউ বাঁচেনি, বড় মামিমার বড় ছেলেও না, ছোটমামাও না, কেউ না, তবু আশায় বুক ভরে থাকে। চারিদিক চেয়ে দেখে পলাশ, রুমাকে দেখতে পায় না, মল্লিকাকেও না, দোরগোড়ায় শুধু সুকোমল দাঁড়িয়ে। সুকোমলকে পলাশের ভালো লাগে, শুধু ছাঁব আঁকার কথাটি বাদ দিলে, পলাশের মনে হয় সুকোমলও তার-ই মতো মানুষ।

সতেরো

মল্লিকা কখন বিদায় নিল কেউ লক্ষ্য করেনি। অনেক রাতে উৎসবান্তে রুমা তাকে অনেক খুঁজেছিল।—কি ক'রে সে বাড়ি গেল, পলাশ? একা একা অত দূরে যাওয়াটা কি ঠিক হলো?

পলাশ বললে,—ওর জন্য কেন ভাবো, রুমা? দুনিয়ার সব বিষয় ও আমাদের চাইতে বেশি বোঝে।

রুমা একবার পলাশের মুখের দিকে চেয়ে দেখে, কিছু বলে না।

আজকাল শ্যামলী যেন একটু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে। দুদিন আগেও মোহনের জন্য যার কল্‌জে ফেটে যাচ্ছিল, মোহন গঙ্গাসাগরে চলে গেলে পর দিনান্তে কি একবার তার কথা মনেও আনতে নেই! শ্যামলীকে কিছু বলতে সংকোচ বোধ হয়। মল্লিকার মাইনে-করা লোক হ'লেও শ্যামলীর মনের মধ্যে একটা দরজা বন্ধ করা থাকে, মল্লিকা প্রবেশ করতে পারে না। আজ কিন্তু না বললেই নয়, রাত দশটা বেজে গেছে, এখনো রান্নাঘরে আলো জ্বলছে, হাসিগল্প শোনা যাচ্ছে। মল্লিকা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই একটি কালো ছেলে চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে, মল্লিকাকে সংক্ষিপ্ত একটি নমস্কার ক'রে, পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

—ও কে শ্যামলী?

—ও ব্রজেন।

—কে ব্রজেন?

—ঐ আমাদের পাড়ায় থাকে। একটা দরকারে এসেছিল।

—এত রাত্রে আবার কি দরকার, শ্যামলী?

শ্যামলী আজ আবার গয়না পরেছে, কপালে একটা খয়েরের টিপও দিয়েছে। শ্যামলী হেসে বলে,—তুমিও তো আজ রাত ক'রে ফিরেছ, দিদি। এত রাতে এতটা পথ একা একা ফেরা কি ভালো? ঐ মোড় ছাড়লেই পাড়াটা আর ভালো না, দিদি।

ঝি চাকরের মুখে এ ধরনের কথা শোভা পায় না। কিন্তু শ্যামলীদের চোদ্দ পুরুষে কেউ কখনো ঝি-চাকরের কাজ করেনি, কেবল শ্যামলীকেই মল্লিকা এ বাড়িতে নিয়ে এসেছে। কোমল কণ্ঠে শ্যামলী বলে,—জল খাবে, দিদি? সত্যিই ব্রজেনটার কোনো আক্কেল নেই। আমাদের পাড়ার সব যখন-তখন লোকের বাড়ি যায় কিনা, ঐ একটা অভ্যেস হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মানা ক'রে দেব।

মল্লিকা কোনো কথা বলে না, ক্লান্ত পদে জান্‌লা-দরজার ছিট্‌কিনি বন্ধ করে।—সিঁড়ির দরজা দেখে নিও, শ্যামলী, আমি শুতে গেলাম।

—দিদি।

মল্লিকা ফিরে দাঁড়ায়।—আমার কেমন ভয় ধরেছে, দিদি।

—ভয়? কিসের ভয় শ্যামলী?

—জানো তো আমার ছোড়দা লোক ভালো নয়, রাতে আবার পাড়ায় যাওয়া-আসা শুরু করেছে।

—তোর যেমন কথা! যাওয়া-আসা শুরু করেছে তো কি হয়েছে?

—ওর হাতে টাকা-পয়সা নেই দিদি, কখন কি ক'রে বসে, ভয় লাগে।

মল্লিকার বুকটাও ধুক ক'রে ওঠে।—কি যে বলিস শ্যামলী! পুলিশ আছে, জেলখানা আছে, ওর প্রাণে ভয়ডর নেই?

—একবার জেল খেটে এসেছে, ওর আর ভয় নেই। কানকাটাদের আবার ভয়ডর কি দিদি?

রাতটাকে যেন বড় বেশি অন্ধকার মনে হয়। গঙ্গার উপরের জান্‌লাগুলির শুধু শার্শি দেওয়া, বাইরে থেকে কাঁচ ভেঙে, হাত গলিয়ে ছিট্‌কিনি খুলে ফেলতে কতক্ষণ! জোর ক'রে মল্লিকা মন থেকে ভয় ঝেড়ে ফেলে দেয়।—সব বন্ধ ক'রে দিইছি, দিদি। আজ তোমার ঘরে শোব, প্রাণটা কেমন করছে।

মল্লিকা অবাক হ'য়ে শ্যামলীর মুখের দিকে চায়, শ্যামলীর চোখে শঙ্কার ছায়া।

—আয় তবে।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যায়, মুহূর্তের মধ্যে মল্লিকা সজাগ হ'য়ে ওঠে। কোথায় একটা দরজা হাওয়ায় নড়ছে। কিন্তু হাওয়ায় নড়ছে কেন? আজ তো হাওয়া নেই। মল্লিকা বিছানা থেকে নেমে পড়ে।

—কোথায় যাচ্ছ, দিদি? পায় পড়ি, যেয়ো না।

মল্লিকা আলোর সুইচের দিকে হাত বাড়াতেই শ্যামলী তার হাত চেপে ধরে।—পায় পড়ি দিদি, আলো জেবলো না।

শ্যামলীকে কি শেষে হিস্টিরিয়ায় ধরল নাকি, সারা দেহ পাতার মতো কাঁপছে, কিন্তু হাতের মুঠিতে প্রবল শক্তি। শান্ত স্বরে মল্লিকা বলে,—কি হয়েছে খুলেই বল্ না, শ্যামলী, কিসের জন্য এত ভয়?

শ্যামলীর ভয় দেখে মল্লিকার মন থেকে সব ভয় দূর হ'য়ে যায়, রক্তস্রোতের চাঞ্চল্য আপনা থেকেই স্বাভাবিক হ'য়ে আসে। চারিদিক নিস্তব্ধ, সব বুঝি তবে কল্পনা, ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে মাত্র রাত বারোটা, এই তো ঘণ্টা দেড়েক হলো শুয়েছে, এরই মধ্যে কি আর এমন হ'তে পারে!

মল্লিকা হাত বাড়িয়ে আলো জেবলে দিল, সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো বারান্দার বন্ধ জানলার বাইরে কিসের একটা আকুল ঝটপটি। শ্যামলী এক হাতে নিজের কম্পিত ঠোঁট দু'খানি চেপে ধরে, বিস্ফারিত নয়নে বিবর্ণ মুখে জানলাটার দিকে চেয়ে আছে। মল্লিকা বারান্দার কোণায় দাঁড়িয়ে লোহার ডাণ্ডার দিকে তাকাতেই, মুখ থেকে হাত নামিয়ে শ্যামলী বললে,—ছোড়দা।

ততক্ষণে দূরের পথে কেমন একটা সোরগোল উঠেছে, সবটা মিলে যেন কোনো নাটক থেকে চুরি-করা একটা রোমাঞ্চময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। মল্লিকা যেন তার দর্শক হ'য়ে গেছে, একটুও ভয় করছে না। জানলার ছিটকিনি খুলে শ্যামলীর ছোড়দাকে মল্লিকা হাত ধরে টেনে বারান্দায় তুলল।

এক মাথা খাটো খাটো কালো কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল, কষ্টিপাথরে খোদাই-করা কাটা-কাটা নাক-মুখ, চোখ দুটি অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল, উত্তেজনায় বুকটা উঠছে পড়ছে। মুখে তার কথা নেই।

শ্যামলী ঝড়ের মতো গিয়ে তার উপর পড়ে,—কি সর্বনাশ ক'রে এসেছ বলো।

মুন্সি মাথা নাড়ে,—না, না, কিছু করিনি। হতাশ কণ্ঠে বলে,—সিন্দুকে একটা কাণা-কড়িও ছিল না রে শামুলি, একেবারে শূন্যি খাঁ খাঁ করছে!

সোরগোলটা ততক্ষণে বড় কাছে এসে গেছে, কার যেন গাড়ি এসে বাড়ির সামনে থেমেছে, কে ডাকাডাকি করছে।

চাপা গলায় মুন্সি বললে,—খুলিস না রে শামুলি, আবার হাতে হাত-কড়া দেবে। সিন্দুক ভেঙেছি, জানাজানি হয়েছে। হাঁ ক'রে আছে খালি সিন্দুক। কেউ বিশ্বাস করবে না ওতে কিছু ছিল না; দাদাও না, বুক পেতে আগলেছিল এতটা কাল!

মল্লিকা মুন্সিকে নিজের ঘরে ঠেলে পুরে দিয়ে, দরজা খুলে দিল। বাইরে পলাশ দাঁড়িয়ে।—তুমি এত রাত্রে?

মল্লিকার আধখানা শ্রবণ তখনো পথের দিকে। কিন্তু আর ভয় নেই, তারা এবাড়ির সামনে গাড়ি দেখে, আলো দেখে, অন্য পথে চলে গেছে। মল্লিকা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

—কাউকে কিছু না ব'লে বড় যে চলে এলে একা একা, আমাদের একটা দায়িত্বজ্ঞান আছে তো। ঠিকমতো পৌঁছলে কি না দেখতে এলাম।

মল্লিকার জন্য পলাশের ভাবনা হয়েছে, পলাশ মল্লিকার খোঁজ নিতে এসেছে। কিন্তু এখন তো পলাশের এখানে বসা চলে না, মুন্সিকে কোনো একটা নিরাপদ স্থানে সরানো দরকার। ঠিক হয়েছে; এ বাড়ির চাইতে নিরাপদ স্থান আবার কোথায় পাওয়া যাবে। মল্লিকা মনে মনে খুশি হ'য়ে ওঠে, মুন্সিকে দুচার দিন এখানে লুকিয়ে রাখলেই ল্যাঠা চুকে গেল। এবার পলাশ গেলেই ব্যবস্থাটা ক'রে ফেলা যায়।

পলাশ মল্লিকার মুখের দিকে চেয়ে ভাবে কোথায় গেল মল্লিকা, যে মল্লিকার জন্য তার এত উদ্বেগ হয়েছিল? পলাশ উঠে দাঁড়ায়।

ঠিক সেই সময় মল্লিকার ঘরের দরজা খুলে মুন্সি বেরিয়ে এল। ভারী সুন্দর দেখতে মুন্সি, পরনে একটা হাত-কাটা শার্ট আর খাকি ট্রাউজার, তাকে দেখে একটা উইলো গাছের চাবুকের কথা মনে হয়। শ্যামলীর ছোড়দা ব'লে চেনা যায় না।

পলাশ বললে,—চাঁল মল্লিকা।

আঃ, বাঁচা গেল। পলাশ চলে গেলে মল্লিকা বললে,—দাঁড়াও মুন্সি; ওরা তোমাকে দেখেছিল?

—দেখেছিল বৈকি, দিদি। দাদাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে এলুম যে। দাদার মাথাটা ঠক ক'রে দেয়ালে ঠুকে গেল, আর রক্ত ঝরতে লাগল। বৌদিদি হায়-হায় ক'রে উঠল, আমিও সেই ফাঁকে পালিয়ে এলুম।

মুন্সি শেষ পর্যন্ত রাজী হ'য়ে গেল দুচার দিন এখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে। এতক্ষণ শ্যামলী রান্নাঘরে গিয়ে বসেছিল, এবার সে বেরিয়ে এসে বালিশ-মাদুর পেতে ভাঁড়ার ঘরের সামনে মুন্সির শোবার জায়গা ক'রে দিল। শ্যামলী সে রাত্রে খুব কেঁদেছিল।

মল্লিকার জীবনে কখনো এমন নাটকীয় ঘটনা ঘটেনি, যেন কোনো ফিল্মে দেখা ছবির মতো। শেষ রাত্রে মল্লিকা ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন এই প্রথম মল্লিকার আপিশে যেতে দেরী হল।

আঠারো

কারো কারো কপালে সুখ লেখা থাকে না। হাজার সুখের উপকরণ থাকলেও তারা সুখী হ'তে পারে না। এক একটা গ্রন্থিই থাকে ঐ রকম, তাদের কেউ সুখী হয় না। শ্যামলীদের বাড়ি সে রকম। তবে ওদের উপকরণের বালাইও নেই।

মিনামাসিমারাও কেউ সুখী নন। কিন্তু মিনামাসিমা বলেন,—কাঁদতেই যদি হবে তবে যেন কিংখাবের বালিশে মাথা গুঁজে কাঁদতে পারি।

মল্লিকা একবার মিনামাসিমার কাছ থেকে একখানি পুরানো ইংরেজি বই চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল। মাইকেল আর্লেনের লেখা 'দি গ্রীণ হ্যাট'। তার মধ্যে একখানি হলদে হ'য়ে-যাওয়া চিঠি ছিল, তার খামও ছিল না। মল্লিকার মা বলতেন, পরের চিঠি পড়তে হয় না, তবু এ চিঠিখানি মল্লিকা পড়েছিল। কুড়ি বছর আগে মিনামাসিমার স্বামীর লেখা চিঠি। চিঠিখানি পড়ে মল্লিকার মনে হয়েছিল মরা ভালোবাসার মতো নিদারুণ মরা জিনিস আর হয় না; কোথাও একটু হতাশা নেই, শ্লেষ নেই, দুঃখ নেই। আশা না থাকলে হতাশা আসে

না, প্রাণে না বাজলে শ্লেষ হয় না, সুখস্বপ্ন না দেখলে দুঃখ লাগে না।

ঐ একটি চিঠি পড়ে মিনামাসিমার গোটা বিবাহিত জীবনটি মল্লিকা আঁচ ক'রে নিয়েছিল। তবু তো রুমা একদিন জন্মেছিল। ভালোবাসা দিয়ে গড়া না হ'লে কারো প্রতিটি অঙ্গ অমন অপরূপ সুন্দর কেমন ক'রে হয়?

কত দিন থাকে ভালোবাসা? মিনামাসিমার স্বামী নাকি বড় সাধ ক'রে বিয়ে করেছিলেন। কি রকম ভালোবাসা, যে প্রতিদান না পেলে একেবারে মরে যায়? প্রতিদান পেলেই বা শেষ পর্যন্ত কি হয় ভালোবাসার? প্রতিদিনের গ্লানি লেগে লেগে সব মোহ দূর হ'য়ে যায়। তবে কেন বুক ফেটে যেতে চায়, কেন মনে হয় জীবনটা ব্যর্থ হ'য়ে গেল?

রাঙা দিদিমণি কেবলি ডেকে পাঠান। ছোট একটা জিনিস হাতে ক'রে নিয়ে গেলে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে যান। ভালোবাসার মানুষটিকে না পেয়েও তো বেশ কেটে গেছে রাঙা দিদিমণির জীবন।

মুন্সি এসে জুটবার দু'দিন পরে, ছোট ছোট দু'খানি রেশমী রুমাল উপহার নিয়ে মল্লিকা নিজে থেকেই রাঙা দিদিমণিকে দেখতে গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাঙা দিদিমণি মল্লিকাকে দেখেন, ফুলের মতো দু'খানি হাত দিয়ে মুখখানি ধরে চুমো খান, কিসের একটা মৃদুমধুর গন্ধ ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে। ছোট্ট একমুঠো মানুষ, এত হাল্কা, এত শুভ্র, এত সুন্দর, মল্লিকা তাঁকে এক গোছা ফুলের মতো জড়িয়ে ধরে।

রাঙা দিদিমণির মন খারাপ।—কেউ আমাকে দেখতে আসে না, মল্লিকা, কেউ আমাকে কিছু বলে না। সুন্দরী ছাড়া দু'দণ্ড কেউ আমার কাছে বসবারও সময় পায় না।

—তোকে কি বলেছি আমাদের বাড়িতে সস্তাহে একদিন ক'রে আমরা 'অ্যাট-হোম' থাকতাম? সোসাইটি ছে'কে সেদিন আমাদের বাড়িতে আসবার হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। আমরা যার তার সঙ্গে মিশতাম না বুঝলি। এখনকার মতো দু'পয়সার বড়লোকেরা আমাদের বাড়িতে ঠাঁই পেত না। রবিঠাকুরের দল মোজা পায়ে না দিয়ে কার বাড়ি যেন নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল ব'লে আমার বাবার সে কি রাগ! মাঝে মাঝে যে ছুটোছাটা বাজে লোক আমাদের অ্যাট-হোমে এসে জুটতো না তা নয়। তখনকার দিনে আমাদের অবারিত দ্বার থাকতো, জানিস। একবার ঐ রকম একটা লোক এসে পান-খাওয়া-দাঁত বের ক'রে কি সব পাঁ-ভতী গল্প করেছিল, পুরুষরা খুব হেসেছিল। আমি কন্‌ভেণ্টে পাঁড়ু, অতটা মানে বুঝতে পারিনি। আর আমার মা হাতলওয়ালা চশমাখানি তুলে নিয়ে তার দিকে এতক্ষণ ধরে চেয়েছিলেন যে সে উঠে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

মিনামাসিমাও কখন এসে কাছে বসেছিলেন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—তখনকার ব্যাপারই ছিল অন্যরকম। জীবনে একটা শ্রী ছিল, চটি পায়ে দিয়ে লোকের বাড়ি যাওয়া এ আমরা ভাবতে পারতাম না। আজকাল মেয়েরা নিজেদের এত সস্তা ক'রে ফেলেছে যে কেউ ওদের বিয়েই করতে চায় না।

মল্লিকা হেসে বললে,—শুনেছি মেয়েরা নাকি বেশি লেখাপড়া শিখে ফেললে, ছেলেরা তাদের বিয়ে করতে ভয় পায়, পাছে তাদের মতামত নিয়ে অশান্তি হয়।

মিনামাসিমা কাষ্ঠ হেসে বললেন,—মুখ্যুদের মতামত নিয়ে অশান্তি হয় না? তবু খানিকটা লেখাপড়া জানা থাকলে মতামতগুলো কিঞ্চিৎ ভবিষ্যদ্যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে তোর মতো অতিরিক্ত স্বাধীন মেয়েদের ছেলেরা সহজে বিয়ে করতে চাইবে না, মল্লিকা। বাইরে অতটা স্বাধীনতা দেখাস কেন? রুমাকে দেখ, আসলে পাথরের মতো কঠিন, কিন্তু

কেমন একটা মোলায়েম শান্ত ভাব। উগ্র মেয়েদের কেউ পছন্দ করে না।

মল্লিকা যে একথা শুনে খুশি হলো না সে কথা বলা বাহুল্য। শ্যামলীর কথা মনে পড়ল। ভারী উগ্র মেয়ে শ্যামলীও, সব বিষয় মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। কে-ই বা ওকে ভালোবাসে? মুন্সির সঙ্গে তো এমনি উঠে পড়ে ঝগড়া লাগায় যে মল্লিকা ভয়েই মরে এই বুঝি একটা মারপিট হ'য়ে পাড়া ডেকে এনে উপস্থিত করে। অথচ লক্ষ্মীছাড়া মুন্সির জন্য শ্যামলী এক্ষুণি প্রাণ দিতে পারে। ওদের দু'জনকে নিয়ে মল্লিকার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হয়েছে। রোজ ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফেরে, না জানি গিয়ে কি দেখবে! মল্লিকা উঠে দাঁড়ায়,—সন্ধ্যা হ'য়ে গেল, আসি রাঙা দিদিমণি।

মিনামাসিমা বলেন,—যতই স্বাধীন হও না কেন, কুসংস্কার ছাড়তে পারো না। যাবার সময় 'আসি' বল কেন?

রাঙা দিদিমণি মল্লিকার পক্ষ নেন,—কুসংস্কার আবার কি? 'যাই'-এর চেয়ে 'আসি' শুনতে ভালো, তাই ব'লে। আচ্ছা, পলাশ কেন আমাকে দেখতে আসে না, মল্লিকা?

পলাশ? তাই তো, মল্লিকা তো আজকাল পলাশের খবর রাখে না। অথচ মল্লিকার জীবনে কবে পলাশ ছিল না একথা মল্লিকার মনে পড়ে না।

এর মধ্যে সিঁড়িতে একটা গোল শোনা যায়, ঝড়ের মতো বিপাশা এসে উপস্থিত হয়। আজ চিনতে পারা যাচ্ছে না, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, সাজসজ্জা নেই, ঠোঁটে রঙ নেই।—কি হবে মিনামাসি, চার দিন ধরে ববির এক-শো পাঁচ জ্বর, সারা গা জ্বরে লাল হ'য়ে উঠেছে, বৌদি হাসপাতালে পাঠাতে চাইছে।

—কেন, হাসপাতালে কেন, বিপাশা?

—বলছে বসন্তর লক্ষণ, ঘরে রাখা ঠিক নয়।

—ঠিকই বলেছে, বিপাশা। ওরও তো ঘরে ছেলেপুলে আছে।

—তা হ'লে আমি যে তাকে দেখতে পাব না!

—সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়াও, কত দেখ ওকে? মিস বিশ্বাসের কাছে তো পড়ে থাকে। শুনেছি তোমার যে আবার একটা ছেলে আছে সে কথা তুমি সকলের কাছে স্বীকার-ই কর না।

বিপাশা সে কথায় কান দেয় না।—কি হবে, মল্লিকা, ববির যদি কিছু হয় তো তা'হলে আমার কি হবে? ওর টিকে দিইনি জানো? কি যেন হয়েছে ওর, রোজ বেরিয়ে যাই কিছু বলে না, কাল থেকে আমাকে এক দণ্ড ছাড়তে চাইছে না, কেবল গলা জড়িয়ে ধরছে আর বলছে, 'আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না, মা, তুমি যেও না।' জোর ক'রে ছাড়িয়ে এলাম। বিপাশার চোখ দিয়ে জল পড়ে।

মল্লিকা বললে,—চলো, একবার দেখি গিয়ে।

বিপাশা যেন অকূলে কূল পায়।—থাকবে, রাতটা। মল্লিকা? তা হ'লে মনে কত যে সাহস পাই। এ-বিপাশাকে মল্লিকা চেনে না, এ তো সেই ফ্যাশানেব্‌ল বিপাশার মতো নয়। খুঁটি খসে পড়লে এমনি বোধ করি হয়। একটা কিছু জড়িয়ে ধরতে না পারলে দাঁড়ানো যায় না।

কিন্তু মল্লিকাকে সেখানে রাত কাটাতে হয়নি। খবর পেয়ে পলাশ আর শম্ভু সরকার এসেছিল। বিপাশার ছেলের অবস্থা দেখে মল্লিকার প্রাণ উড়ে গেছিল, এবার সাহস ফিরে এল। মল্লিকার বাড়িতে একটা খবর দেওয়া দরকার, শ্যামলী নইলে ব্যস্ত হ'য়ে উঠবে।

পলাশ বললে,—তার চেয়ে তুমি শম্ভুর গাড়ি ক'রে চলেই যাও, মল্লিকা, এখানকার যা ব্যবস্থা আমরা করব।

শম্ভুর নতুন গাড়ি মল্লিকাকে পৌঁছে দেয়। মল্লিকা ভাবে, আশ্চর্য, বিপাশার ছেলে মা-র গলা জড়িয়ে ঝুলে থাকে, চোখের দৃষ্টি হারালে বিপাশাকে আঁকড়ে ধরে। কেমন যেন মনে হয়, জীবনে কোনটার দাম বেশি আর কোনটা বা কম সব গুলিয়ে যাচ্ছে। থাকতে ইচ্ছা করছিল। ও চলে গেলেও এদের কোনোই অসুবিধা হবে না ভেবে দারুণ দুঃখও হচ্ছিল। কেন মল্লিকা কলকাতায় থাকে? সে কি তার কাজের জন্য? আজ কাজ ছেড়ে দিলে এখুনি দলে দলে অন্য মল্লিকারা দরখাস্ত পাঠিয়ে দেবে। মল্লিকাকে দিয়ে কারো কোনো সত্যিকার দরকার নেই।

শ্যামলী দরজা খুলে দেয়।—দিদি, এলে? বাঁচলাম দিদি। ছোড়দা সেই সন্ধ্যায় বেরুল আর ফিরল না।

তাইতো, শ্যামলীর তো মল্লিকাকে দিয়ে দরকার আছে।

উনিশ

মুন্সি সত্যি সত্যি বেমালুম উধাও হ'য়ে গেল। শ্যামলীর চাইতে মল্লিকার-ই যেন উদ্বেগ বেশি।—কোথায় গেল সে, শ্যামলী? এখানেই তো বেশ নিরাপদে ছিল।

—নিরাপদ? ছোড়দা তো নিরাপদ চায় না।

—তবে এসেছিল কেন? নিরাপদ চায় না তো চায় কি?

—ঠেকায় পড়ে এসেছিল, দিদি, নইলে তোমাদের সাহায্য সে কখনো নিত না। বড়-লোকদের উপর ওর ভারী রাগ।

—আমরা তো বড়লোক নই, শ্যামলী।

—আমাদের কাছে বড়লোক, দিদি। যাদের খাওয়ার ভাবনা নেই, তাদেরই আমরা বড়লোক বলি। ভাতের খোঁটা দিয়েছে কেউ কখনো তোমাকে?

মল্লিকা আবার জিজ্ঞাসা করে,—কি চায় ও? চাকরি-বাকরি করে না কেন?

—টাকা চায়, দিদি, পৃথিবীর সব থেকে ভালো জিনিস টাকা, সেই টাকা চায়। ছোটবেলা থেকে বড় কষ্টে ওর দিন কেটেছে, তাই টাকা চায়, দিদি।

—টাকা চায় তো রোজগার করে না কেন?

—রোজগার-করা কম টাকা চায় না ও। একসঙ্গে অনেক টাকা চায়।

—কি করবে?

—খরচ করবে।

—দু'হাতে ওড়াবে, বল্। তারপর ফুরিয়ে গেলে কি করবে?

—এত টাকা চায় যে ফুরোবে না। ফুরোলেই আবার আসবে।

—ভালোভাবে অত টাকা পাওয়া যায় না, শ্যামলী।

—ভালোভাবে টাকা ছোড়দা চায় না তো।

—টাকা দিয়ে কেউ সুখী হয় না।

—হয়, দিদি, হয়। টাকা থাকলেই সব হয়। আমাদের নেই, আমরা সে কথা জানি। টাকা দিয়ে যতটুকু সুখ হয় তাতেই আমরা খুশি।

মল্লিকার মা-ও টাকা ভালোবাসেন। কিছুই বিশেষ নেই ওদের ঘরে, তবু মল্লিকার মার টাকার উপর অগাধ বিশ্বাস। বলেন,—রেখে দে ওসব কথা। যাদের মেলা টাকা, টাকা নইলে এক দণ্ড যাদের চলে না, তারাই শুধু বলে যে টাকা দিয়ে সুখ হয় না। টাকা থাকলে সব হয়। টাকা থাকলে সুখ কিনে ফেলা যায়।

মল্লিকা বলে,—সুখ কেনা যায় না, মা, সুখের জিনিস কেনা যায়।

—তফাতটা কি হলো, তাই বল্? আমাকে কেউ লাখ টাকা দিলে আমার আর কোনো দুঃখ থাকতো না।

মল্লিকার মা বছরে বছরে লটারির টিকিট কেনেন, এ বছর না পেয়ে, আসছে বছরের আশায় থাকেন। টাকার উপর অগাধ বিশ্বাস।

মাঝে মাঝে মল্লিকা বলে,—কই মিনামাসিমারা তো সুখী নন।

—কে বলেছে সুখী নন? এক একজন অমনি অকৃতজ্ঞ হয় যে সুখকে স্বীকার করতে চায় না। কম টাকা তোর রাঙাদিদিমণির? একবার একটা দশ হাজার টাকার সার্টিফিকেট ভুল ক'রে ফেলেই দিয়েছিলেন। কে যেন বাজে কাগজের মধ্যে থেকে খুঁজে দিয়েছিল। অবিশ্যি তাই ব'লে তাকে একটা পয়সাও দেননি। কাউকে ওঁরা কিছু দেন না। জীবনে কখনো আমাকে একটা উপহার দিয়েছেন ব'লে তো মনে হয় না।

বিপাশার হাতে টাকা ছিল, জলের মতো সে সব খরচ করল। কিন্তু ছেলেটা বাঁচল না। বিপাশার গলা জড়িয়ে, বিপাশার বুকে মুখ লুকিয়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা মরে গেল। কিছু বাকি রাখেনি করতে বিপাশা, সবাই তাই ব'লে সান্ত্বনা দিল। কোল থেকে ছেলেটাকে নামিয়ে রেখে পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল বিপাশা। চোখে এক ফোঁটা জল নেই। শেষে যা করবার ওর দাদা, বৌদি আর বন্ধুবান্ধবরা করল। বিপাশা উঠল না। বাড়ি ফিরে এসে মিনামাসিমা তাই নিয়ে নিন্দা করতেই, রুমা হঠাৎ রেগে গেল। জীবনে এই প্রথম রুমাকে রাগ করতে দেখা গেল।

হাতের হ্যাণ্ডব্যাগটা ছুঁড়ে টেবিলের উপর ফেলে রুমা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।—মা, তোমার কি সত্যি হৃদয় ব'লে কিছু নেই? আমার বাবা যে কত দুঃখে মারা গেছিলেন, এখন বুঝতে পারি।

রুমা ঘর থেকে চলে যায়। মিনামাসিমার লোহার বর্মে চিড় খায়। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে মল্লিকার দিকে ফেরেন,—ছিল, মল্লিকা, আমারো হৃদয় ছিল একদিন। কিন্তু সে এমনি আঘাত খেয়েছিল যে তার আর কিছু বাকি থাকেনি।

মিনামাসিমাও শয্যা নিলেন। রাঙা দিদিমণির বসবার ঘরে ব্যাপারটা ঘটেছিল। সবাই যে যার চলে গেলে, রাঙা দিদিমণি আরামকেদারায় পা দুটি ভালো ক'রে মেলে দিয়ে বললেন,—যা তো মল্লিকা, সুন্দরীকে বল্‌গে যা আমার খাবার সময় হ'য়ে গেছে।

মল্লিকা এমনি অবাক হ'য়ে গেল যে খানিকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কথা সরল না। রাঙা দিদিমণি বললেন,—বোধ হয় আমাকেই খোঁটা দিয়ে গেল, কিন্তু আমার কোনো দোষ ছিল না বাপু। রাণা ওকে বিয়ে না করলে আমি কি করব বল।

আজ মল্লিকার কিছু শুনতে ইচ্ছা করছিল না, ধীরে ধীরে উঠে সুন্দরীকে ডেকে দিয়ে সে বিদায় নিল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুনতে পেল রাঙাদিদিমণি খাবার নিয়ে সুন্দরীর সঙ্গে কি বকাবকি করছেন।

—কেন বাঁচতে চায় মানুষ বেশিদিন? কিছু থাকে না। কোন্ যাদুবলে রাঙাদিদিমণি রূপটাকে ধরে রেখেছেন, কিন্তু মনের ভিতরটা শুকিয়ে খাক হয়ে গেছে। সেখানে কিছু নেই।

নিচের হল্‌ঘরে সুকোমল দাঁড়িয়েছিল, মিনামাসিমার কল্যাণ সমিতির কি মিটিং আছে কাল, ওকে একবার আসতে বলেছিলেন। মল্লিকা ওকে ভাগাতে চেষ্টা করে,—আজ কোনো কাজ হবে না, সুকোমল, সকলের মন খারাপ; যে যার ঘরে দোর দিয়েছে, তুমি বরং কাল সকালে এসে যা করবার কোরো।

সুকোমল যেতে চায় না।—রুমাও শুয়ে পড়েছে? কি যে বলো মল্লিকা! ওর সঙ্গে একবার দেখা হয় না?

—না হয় কালই দেখা করলে, আজ বাড়ি যাও না, সুকোমল।

—এখন বাড়ি গেলে মা ভাববে। তুমি কোথায় যাচ্ছিলে, যাও না।

উপর থেকে সুন্দরীর গলা শোনা যায়।—বড়-মা বলছে, কে এসেছে ওনার কাছে ডেকে দিতে, ওনার একা থাকতে ভালো লাগছে না।

সুকোমল তখুনি উপরে যায়, মল্লিকা বাড়ি চলে আসে।

কিন্তু বাড়ি ফিরেও কিছুতে মন বসাতে পারে না। আপিশের কতকগুলি তাগাদার কাগজপত্র নিয়ে বসল, অক্ষরগুলো চোখের সামনে ঘুরতে লাগল, শ্যামলীর বৌদি এসে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াতেই মল্লিকা যেন নিজের কাছ থেকে নিজে রেহাই পেল।

—কি হয়েছে রে? ছেলেটার আবার অসুখ নাকি?

—না, দিদি, শামুলির দাদার কথা বলছিলাম।

—কি হলো রে শামলির দাদার?

—কি যেন, গুম্ হ'য়ে থাকে সারাটা দিন, ভালো ক'রে খায় দায় না, অমন ভালো সিন্দুকটা দেয়াল থেকে হিঁচড়ে তুলে দিয়েছে গঙ্গায় ফেলে। বেচলেও তো কিছু পাওয়া যেত। কথাই কয় না কারো সাথে, কিছু জিগ্যেস করতেও ভয় করে। হ্যাঁ দিদি, কোনো ওষুধ নেই?

মল্লিকার হাসি পায়।—মনের দুঃখ কি ওষুধ দিয়ে সারে কখনো?

—কেন বড়দি তো কি একটা গুঁড়ো দিত কাগজে ক'রে, ওতেই সব সেরে যায়। একটু খুঁজেই দেখ না, সঙ্গে নিয়ে যায়নি নিশ্চয়।

তারপর দাওয়ায় ঠেস দিয়ে বসে পড়ে বৌ।—কি যেন, দেওরটার জন্য মনটা কেমন করে দিদি। ওর চোখ যদি সেদিন দেখতে! লোহার ডাণ্ডা দিয়ে আর কি একটা যন্ত্র দিয়ে দিলে সিন্দুকটার দরজা ভেঙে! বিশ্বাস করো দিদি, কিচ্ছু ছিল না ওর মধ্যে! এমনি অবাক হ'য়ে গেছিল সে যে পালাবার কথা ভুলে গেল। আর আমিও এমনি অবাক হলাম যে লোক্ ডেকে ওকে ধরতে হবে তাও মনে হলো না। ওর দাদা দু'হাত মেলে ওকে ধরতে এল, ও তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে এক ছুট্! তখন মুখটা যদি দেখতে! আমারো মনটা কেমন হ'য়ে গেছে সেই থেকে। মতিগতি ওর ভালো না দিদি, কিন্তু বড় দুঃখী। ওর মা এত রোগা ছিল যে মার দুধটাও পায়নি। কই ওষুধ দেবে না দিদি?

—সে খাবে কেন?

—চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেব, সে জানতেও পারবে না গো। দাও, যা হয় কিছু।

মল্লিকা আর কথা না ব'লে মিমিদির দেরাজ খুলে একটু সুগার অফ মিল্‌ক ঢেলে কাগজের মোড়কে ক'রে বৌয়ের হাতে দিল।

তারপর বহুক্ষণ গঙ্গার দিকে চেয়ে বসে রইল। কোথায় গেল মুন্সি? হাতে তো একটা কানাকড়িও নেই। এদিকে দারুণ শৌখিন মানুষ, পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে আছে, তাও রোজ জামা-কাপড় কেচে ইস্ত্রি করবে; ফুল-কাটা গেঞ্জি পরে মুন্সি, পায়ে বেশ দামী জুতো, সেলুনে ছাড়া চুল কাটে না। টাকাকড়ি কোথায় পায় কে জানে! কিছু নিয়ে যায়নি, যেমন খালি হাতে এসেছিল তেমনি চলে গেছে, কি জানি কোনো বিপদে-টিপদে পড়েনি তো?

বিপাশার কথা ছাড়া সব কথা ভাবে মল্লিকা। রাত গভীর হ'লে শ্যামলী এক পেয়ালা চা ক'রে নিয়ে এল,—আর কিছু না খাবে তো নিদেন এটা খাও, দিদি, বাসি মুখে শুয়ো না।

অন্যমনস্কভাবে মল্লিকা হাত বাড়িয়ে পেয়ালাটা ধরে।

—ছেলেটা কেন ভালো হলো না দিদি? এত তো ওষুধপত্র করলো, ডাক্তার ডাকলো।

—ডাক্তাররা যদি সব অসুখ সারাতে পারত শ্যামলী, তবে তো আর ভাবনা ছিল না।

শ্যামলী দরজার কড়াটা খুঁটতে খুঁটতে বললে,—একটা কথা বলব, দিদি? ছোটখাট অসুখে না হয় ওষুধপত্র করা গেল, কিন্তু বড় অসুখে আমরা কাঠগুদোমের পাঁরের কাছে সিন্নি দিই। অনেক সময় সেরেও ওঠে।

মল্লিকা বললে,—ওসব তোদের মনের ভুল। কিছু না করলেও অনেক সময় সেরে ওঠে।

—তোমরা বিশ্বাস কর না, দিদি, কিন্তু মানুষ ঠেকে গেলে ভগবান অনেক সময় তরিয়ে দেয়।

—ভগবান মানুষকে বুদ্ধি দিয়েছেন, সেই বুদ্ধি দিয়ে ডাক্তাররা ওষুধ দেয়, ভগবান কিছু নিজে এসে চিকিৎসা করেন না, শ্যামলী।

শ্যামলী তবু বলে,—আমাদের ডাক্তার ডাকবার পয়সা থাকে না, দিদি, আমরা তাই ঠাকুরদেবতার মুখ চেয়ে থাকি।

কিন্তু বিপাশাও ভগবানের মুখ চেয়ে ছিল। আগের দিন রাত্রে ডাক্তার যখন তাকে মন প্রস্তুত করতে ব'লে গেলেন, বিপাশা যে নিবিষ্ট মনে ভগবানকে ডেকেছিল সে বিষয় মল্লিকার কোনো সন্দেহ নেই। ভগবান সব সময় শোনেন না।

পলাশের মামাবাড়িতে কারো কোনো বিপদ হ'লে পুজো দেওয়া হয় শান্তি-স্বস্ত্যয়ন হয়। ডাক্তার-বদ্যিও ডাকা হয় বটে, কিন্তু তাদের উপর নির্ভর ক'রে থাকা হয় না। পলাশের মামিদের ছেলেপুলেদের হাতে গোছা গোছা মাদুলি বাঁধা থাকে। ছোটবেলায় পলাশেরও গলায় ছোট ঢোলকের মতো একটা মাদুলি সোনার চেন দিয়ে বাঁধা থাকত। তাই নিয়ে পলাশ নিজেই কত হাসাহাসি করত। কিন্তু কোনো এক দুঃখের দিনে মল্লিকার জীবন থেকেও যদি সব অবলম্বন অদৃশ্য হ'য়ে যায়, মল্লিকাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য কোনো মাদুলি কোনো গুরুদেব পাওয়া যাবে না।

সোজা হ'য়ে উঠে বসে মল্লিকা ঘাড় উঁচু ক'রে মনে ভাবলে, মাদুলি, গুরুদেব আমাদের লাগবে না।

দেরী ক'রে ভাঙা চাঁদ উঠেছে, গঙ্গায় জোয়ার এসেছে, ছোট ছোট ঢেউ-এর বুকে চাঁদের ছায়া পড়েছে, ঘাটের পথে গাছের পাতা চাঁদের ঐ অল্প আলো লেগেই চিকচিক করছে,

দক্ষিণ দিক থেকে বাতাস বইছে।

মল্লিকা উঠে দাঁড়িয়ে ভরা মনে বললে,—এই ভালো, এই ভালো। আবার কিসের দরকার!

কুঁড়

মল্লিকার সঙ্গে পলাশের যে দেখাই হয় না তা নয়। কিন্তু মনের কথা বলবার জন্য সেই পুরনো হুড়োহুড়ি পড়ে যায় না। দু'জনার মাঝখানে যে অদৃশ্য দেয়াল গড়ে উঠেছিল তা দিনে দিনে পাকা হ'য়ে উঠতে লাগল। ছাড়াছাড়ির কারণও যথেষ্ট ছিল। মল্লিকার মা লিখলেন : 'তোমার কি কখনো বুড়ো মায়ের কথা মনেও হয় না? আট মাস বাড়ি আসোনি, শরীরের সেরকম যত্ন নাও না শুনেছি, আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে রামকিষ্ণপুরে একা আছো, ঐ মিমিদি-টি সম্বন্ধে এত সাবধান ক'রে দিলাম, সে কথা কানেও তুললে না। ছেলেমেয়ে নিজেদের পয়সার মুখ দেখলে পর মা-বাপের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়, এ কথার প্রমাণ এবার চাক্ষুষ দেখছি। বিশেষ আর কি লিখিব। ইদানিং আমার শরীর ক্রমশ খারাপ হইতেছে, তবে সে কথা লিখিয়া কোনো লাভ নাই, তোমার তো আসিবার অবকাশ হইবে না'...ইত্যাদি।

চিঠির শেষ অংশের বিশুদ্ধ ক্রিয়াপদগুলি দেখে মল্লিকা বুঝল মা বাস্তবিক-ই উদ্বিগ্ন হয়েছেন। কিন্তু এ সময় ছুটি নেওয়ারও অসুবিধা, অসুখ-বিসুখ, আবার অন্য কর্মচারীদের কারো কারো ছুটি। তার উপর মিমিদিরা না ফেরা পর্যন্ত যায়ই বা কি ক'রে, তারই হেফাজতে সব ছেড়েছুড়ে গেছেন। সেখানে গিয়ে মিমিদি ভালো আছেন, মাঝে মাঝেই একখানি ক'রে হাসিখুশিতে ভরা পোস্টকার্ড আসে। সোমনাথবাবু তাঁর বহুদিনের সখের ঐতিহাসিক উপন্যাসখানি লিখতে সুরু করেছেন, আরো মাসখানেক থাকবার কথা; এখানে এসেই ছাপাখানা আর প্রুফ ক'রে ক'রে তাঁর দিন কাটে, দিন-রাত বই-এর কাজ করেন, বই লিখবার তাঁর অবসর কোথায়? ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে মল্লিকা ভাবলে, নাঃ, এখন ছুটি নেওয়া যায় না।

রাগও ধরল খুব, এ নিশ্চয় পলাশের কাজ, সে গিয়ে এ সব কথা লাগিয়েছে। নইলে মল্লিকার শরীর খারাপের কথা, একা থাকার কথা তো মা-র ঘুণাক্ষরে জানাবার কথা নয়। ভারী রাগ হলো মল্লিকার। চিরকাল মা মামীদের কাছ থেকে কথা গোপন করতেই পলাশ ওর সহায়তা করেছে, এখন সব পাল্টে গেছে। মল্লিকাকে আগ্রায় পাঠিয়ে পলাশ নিজে এখানে থাকতে চায়। অথচ আগ্রাতে পলাশেরই কাজ আছে; একটা পত্রিকার প্রকাশনা, কলেজে অধ্যাপনা, এগুলো কি কাজ নয়? বলে নাকি দীর্ঘ ছুটি নিয়েছে; তারই বা কি প্রয়োজন ছিল? জ্যাঠার সম্পত্তি বুঝে নিতে কারো পাঁচ মাস সময় লাগে? কলকাতায় এসে দেখতে দেখতে কেমন বদলে গেল পলাশ, কেমন সেয়ানা হ'য়ে উঠল, হালচাল কথাবার্তা সব বদ্‌লালো, পোষাক-পরিচ্ছদ, চুল ছাঁটার কায়দা, মায় গোটা চেহারাটা সুদ্ধু পালটে ফেলল। চিরদিন মল্লিকা চেয়েছে পলাশের মফঃস্বলী উগ্রতাটা বদলাতে, তবে এখন এই কলকাতার ছেলেটিকে দেখলে কেন গা জ্বলে যায়?

সুকোমলের সঙ্গে পলাশের গভীর বন্ধুত্ব হয়েছে। ওদের কলা-মন্দিরের ছবি কিনেছে পলাশ, দু' একটা। ওদের খাতায় নাম-লেখানো সভ্য হয়েছে। এ সব তো আনন্দের কথা। আগে পলাশ ফোটোগ্রাফের মতো না হ'লে ছবির নিন্দা করত। ওর মনের অন্ধকার ঘুচে থাকলে তো ভালো কথা। পলাশের ভালো হয় মল্লিকা তো তাই চায়।

কোলের উপর রাখা মা-র চিঠির উপর মল্লিকার চোখের জল ঝরে পড়ে। কেন কাঁদছে মল্লিকা? বিপাশার ছেলে মরে গেলে বিপাশা তো কাঁদেনি। বেশি দুঃখে বুঝি বুকের ভিতরটা জমাট বেঁধে যায়, চোখে জল আসে না। কিন্তু মল্লিকা তো আর নিজের দুঃখে চোখের জল ফেলছে না, পলাশের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মন খারাপ লাগছে ব'লে কাঁদছে। তা ছাড়া ভুলও বলেছে পলাশ, মল্লিকার শরীর খুব ভালো আছে। মাকে তাই জানাতে হবে, মা মিছিমিছি উদ্বিগ্ন হচ্ছেন, মাকে উদ্বিগ্ন করবার পলাশের কোনো অধিকার নেই। ছোটবেলাতেও মল্লিকার মাকে ভারী জ্বালিয়েছে পলাশ। একবার সব পেয়ারা-জেলি ফেলে নষ্ট করেছিল; বল মেরে কতবার জানালার কাঁচ ভেঙে দিয়েছে, মা কত বকাবকি করেছেন; মল্লিকার পড়বার জন্য লুকিয়ে উপন্যাস এনে দিয়েছিল, মা ওর মামীদের ব'লে পলাশকে বকুনি খাইয়েছিলেন—মল্লিকার চোখ দিয়ে এত জল পড়তে থাকে যে চিঠিপত্র লেখা সম্ভব হয় না।

কাজের পরে মিনামাসিমার ওখানে যেতে হয়। মল্লিকার মন খারাপ ব'লে কল্যাণ সমিতির মিটিং তো আর বন্ধ থাকে না। টিলির বড় বোন মলি তার ছেলেমেয়ে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে, তারা কাঁদাকাটি ঝগড়াঝাটি ক'রে সকলকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছে। মিনা-মাসিমা শেষ পর্যন্ত আপত্তি না ক'রে পারলেন না।—বেশ তো ছিল ওরা বোর্ডিং-এ, আবার নিয়ে আসা কেন?

মলি ইতস্তত করাতে টিলি হেসে বলল,—বিপাশার ছেলে মরে যাওয়াতে ওর মন কেমন করছিল।

মিনামাসিমা স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন,—কোথায় দৈবাৎ কার কি হলো, বাস্, অমনি তোমার ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎটা নষ্ট ক'রে দেবে!

মলি এবার মুখ খোলে,—কেন, মাইনে-করা মেট্রন টিচারদের কাছে মানুষ হ'লে খুব ভালো হবে, আর নিজের বি-এ পাশ করা মা-র কাছে মানুষ হ'লে ভবিষ্যৎ নষ্ট হ'য়ে যাবে। কি যে বলেন, মাসিমা!

—নষ্ট হ'য়ে যাবে না? প্রথমত তোমার সমিতি আর সোসাইটি আর পার্টি আর ব্রিজ ক'রে ক'রে তো তুমি বাড়িই থাকবে না। তারপর যেটুকু সময় থাকবে, তাও ওদের কেবল আহ্লাদ দিয়ে মাথা খাবে। শিক্ষা যা পাবার সে আর বি-এ পাশ করা মা-র কাছে পাবে না, পাবে ঐ মাদ্রাজী আয়াটির কাছে। সে তো দুষ্টুর শিরোমণি।

মলি কি বলতে যাচ্ছিল, মিনামাসিমা ওকে কোন সুযোগ না দিয়ে আরো বলতে লাগলেন,—আমি মানুষ হয়েছি দার্জিলিঙের লোরেটোর বোর্ডিং-এ। কি এমন খারাপটা হয়েছি, বলো। গান-বাজনা, অবিশ্যি ইংরেজী গান-বাজনা, আমাদের সময় ভদ্রলোকের মেয়েরা খেয়াল ঠুংরী কাকে বলে জানত না—কুকিং, সেলাই, ড্রইং, পেণ্টিং; তারপর তার পুড়িয়ে কাঠের উপর ডিজাইন তোলা, কলম দিয়ে তেল-রঙ দিয়ে কাপড়ের উপর নক্সা করা, সে সব অবিশ্যি ধোয়া চলত না, কিন্তু সাবধানে রাখলে বেশ কিছুদিন ব্যবহার করা চলত। তারপর ফ্রেঞ্চ এম্ব্রয়ডারি, উল বোনা—কি শিখিনি বলো? ভদ্র ব্যবহার শিখেছি, বিলিতি নাচও শিখেছি; টেবিল সাজাতে, নতুন আলাপ হ'লে কি বলতে হয়—এইরকম হাজার জিনিস শিখেছি, সে সব আজকাল কেউ জানেও না, নামও শোনেনি!

মিনামাসিমার বিদ্যার তালিকার সকলেই খুব প্রশংসা করল। রুমা-ই খালি একটু মন্তব্য করল। শান্ত সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বলল,—সত্যি মা, কত পয়সা, সময় আর শ্রম খরচ ক'রে

এত সব শিখেছে। কোনোটাই কোনো কাজে লাগে না, এই যা।

রুমা আজকাল কি রকম অদ্ভুত সব কথা বলা ধরেছে। একটু ঝাঁঝালো সুরে মিনা-মাসিমা বললেন,—কাজে লাগে না আবার কি! কনভেন্টের মাদারেরা বলতেন, সর্বদাই কাজ করবে, অলস মন শয়তানের কারখানা। কাজে লাগে না মানে?

রুমা বললে,—মানে দরজিরা জামা তৈরী ক'রে না দিলে তোমাদের এম্‌ব্রয়ডারি হতো না, বাবুর্চিরা খানা তৈরী ক'রে না দিলে তোমাদের চাঁজ সুফ্লের আদর হতো না, দোকান থেকে—

—থাক, রুমা। তবু তো তোমাদের মতো ফিল্ম ম্যাগাজিন আর প্রেমের গল্প আমাদের পড়তে দেওয়া হতো না।

রুমা আর মন্তব্য করলো না। দেখে শ্রোত্রীবর্গ হতাশ হ'য়ে গেল। বেশ জমে আসছিল তর্কটা। যাকগে, এখন সমিতির হিসাবপত্রের কথা হোক।

কিন্তু হোক বললেই হয় না, মলির ছেলেমেয়ে এইখানে, এমনি চ্যাঁ-চ্যাঁ শুরু করলো যে সকলেই সেদিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য হলো। মিনামাসিমা নাক থেকে চিমটি-কাটা রিমলেস চশমাটা নামিয়ে রেখে বললেন,—না হয় বোর্ডিং-এ না-ই রাখলে, একটু চুপ করাতে পারো তো?

—কথা শুনছে না যে।

—আহা, কান ধরে দু'টো চড় লাগালে কেমন না শোনে দেখই না।

টিলি বললে,—আমাদের চাইল্ড সাইকলজির বইতে আছে ছোটদের মারপিট করা মানে তাদের দৃষ্টুমির কাছে বড়দের বুদ্ধি পরাজয় স্বীকার করেছে।

মোমো বললে,—তা ছাড়া, গায়ের জোর দিয়ে ছেলেপেলেকে দাবড়িয়ে রাখলে ওদের মনে ফ্রাস্‌টেশনের সৃষ্টি হয়, তাই ওরা বড় হ'লে ঠ্যাঙাড়ে হয়।

—তা হ'লে বাড়িতে রেখে আসনি কেন?

—আয়া ভাইপোর বিয়েতে দেশে গেছে।

মিনামাসিমা ধৈর্য হারিয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, সৌভাগ্যবশত ঠিক সেই সময় মলির ছেলে টানাটানি ক'রে টিলির গলার নতুন জেডের মালাখানি ছিঁড়ে দিল, ঘরময় জেডের ছড়াছড়ি, টিলি তৎক্ষণাৎ ছেলের গালে ঠাসঠাস ক'রে খানকতক চড় কষিয়ে দিল। রাগে, দুঃখে মলি ছেলেমেয়ের হাত ধরে হিড়হিড় ক'রে টানতে টানতে প্রস্থান করল। ঘরময় জেডের পুঁতি ও শান্তি বিরাজ করতে লাগল।

মিনিমাসিমা পুনরায় নাকের উপর চশমাটি বসিয়ে বললেন,—গত বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে ঠিক যতটি আয় ততটি ব্যয়। মল্লিকা, তুমি কিছু শুনছ না!

একুশ

মিটিং-এর শেষে সবাই বিদায় নেবার পর, রাঙাদিদিমণিকে দেখতে গিয়ে, সেখানে পলাশের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ ও তুমুল কলহ।

সকলে আশ্চর্য হ'য়ে গেল যে মল্লিকা তো চিরদিন-ই যা মনে আসে বলে বসে, কিন্তু শান্তশিষ্ট পলাশও আজ বাধাবন্ধ ছেড়ে, আশ মিটিয়ে তার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে নিলে!

কে কবে কি করেছিল দু'জনাই তার লম্বা ফিরিস্তি দিল। রাঙাদিদিমণি মহা খুশি।

মিনামাসিমা গোলমাল শুনে নিচের তলা থেকে উঠে এলেন। সুন্দরী কি একটা কাজের আছিলা ক'রে ঘরের কোণায় থেকে গেল। আর ছিল সুকোমল ও রুমা। আশ্চর্যের বিষয় তারা দু'জনেও কোমর বেঁধে রণক্ষেত্রে নেমে পড়ল।

পনের কুড়ি মিনিট ধরে বিরামবিহীন ঝগড়া হলো। তারপর মল্লিকা-ই আগে উঠে পড়ল।—এত উত্তেজনা রাঙাদিদিমণির পক্ষে ভালো না। আমি চলি।

রাঙাদিদিমণির মহা দুঃখ।—আরে না, তোরা ঝগড়া করবি তো আমার পক্ষে ভালো হবে না কেন। তারপর বলো পলাশ, মল্লিকার মা কি বললেন। তখন, ও মল্লিকা, তুই যাসনে, তাহ'লে জমবে না!

তাই শুনে ঝগড়া থামিয়ে হঠাৎ সকলে হেসে ফেলল। রুমা বললে,—চলো পলাশ, সুকোমল, আমরা সকলে মিলে ওকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

পলাশ বললে,—হ্যাঁ বড্ড রেগেছে, ওকে একা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

সুকোমল বিরক্ত হ'য়ে বললে,—তুমি নিজেই বা কি কম গেলে! যাই হোক, চলো।

বাড়ি পৌঁছে দেখে সেখানেও গোলমাল শুরু হ'য়ে গেছে, শ্যামলী দিশেহারা হ'য়ে গেছে, ওরা পৌঁছলে সে যেন বাঁচল।

—কি হবে দিদি, পুলিশের লোক এসে সেই নাগাড়ে বসে রয়েছে।

সবাই বিস্মিত হয়।—পুলিশের লোক, সে আবার কি?

মল্লিকা বললে,—কেন? কি, বলে কি? মুন্সির খোঁজে এসেছে নিশ্চয়, বলিসনি যে সে কোথায় আমরা কিছু জানি না।

—সে বললে ওরা শুনবে কেন? হতভাগা ছোকরা ছোড়দার হাতঘড়ি পরে চায়ের দোকানে চাল দিতে গেছিল, তেওয়ারি ধরেছে ওকে, বলে নিশ্চয় চোরাই মাল। তেওয়ারির সঙ্গে রঘু ছিল, রঘুর সব দোস্ত্ আছে থানায়, সেখানেও খবর পৌঁছে গেল, ভয়ের চোটে ছোকরা মুন্সির কথা ফাঁস ক'রে দিয়েছে।

একসঙ্গে এতগুলা কথা ব'লে ফেলে শ্যামলী হাঁপিয়ে ওঠে।

পলাশ গম্ভীর গলায় মল্লিকাকে জিজ্ঞাসা করলো,—মুন্সি কে?

মল্লিকা বললে,—বাঃ! মুন্সি কে জানো না? শ্যামলীর ছোড়দা, পুলিশের নজর এড়াবার জন্য এখানে চারদিন ছিল, তুমি তো দেখেছিলে তাকে, সেদিন রাত্রে।

এখন আর গোপন করার কোনো মানে হয় না, সব ভেঙে বলতে হয়। পলাশ দারুণ রেগে যায়,—এত কাণ্ড হ'য়ে গেল অথচ একটি কথা বললে না সেদিন?

—বললে শেষটা যদি তুমি ওকে ধরিয়ে দিতে!

—দিয়েছি ধরিয়ে কখনো? এ-রকম কথা কাটাকাটির কোনো মানে হয় না।

সুকোমল বললে,—আহা, এ সময় তর্ক থামাবে কি না? মল্লিকা খুব বে-আইনী কাজ করেছে, সে বিষয় সন্দেহ নেই। চলো এখন উপরে, দেখা যাক কি করা যায়।

পুলিশ ইন্‌স্‌পেকটর সুকোমলের চেনা; শুধু চেনা কেন একরকম বন্ধুই বলা চলে। তার কাছে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা হলো। খানিকটা মিথ্যে কথাও বলতে হলো। সবই বলা হলো, শুধু মুন্সির সিন্ধুকে ভাঙার কথাটা যে এরা জানতো সেইটে গোপন করতে হলো। শ্যামলীকে ডেকে সামান্য একটু বকাবকি ক'রে দিয়ে খানিকটা গালগল্প ক'রে তারা বিদায় নিল।

—কিছু একটা কেস্-ই নয়, সুকোমল। রুটিন এন্‌কোয়ারী। লোকটা একটা

আন্‌ডিজায়ারেব্‌ল্‌ ক্যারেক্‌টার ব'লে শুনেছি তাই। পাড়ার লোকে অবিশ্যি সর্দার ক'রে থানায় খবর দিয়েছিল, কিন্তু সিন্দুকটার অর্ধেক শেয়ার তো ওর নিজের, নিজের সিন্দুক নিজে ভাঙাটা তো আর অপরাধ নয়। তবে লোকটা শুনেছি সুবিধার নয়। দেখিনি কখনো নিজে, কিন্তু আমাদের খাতায় ওর নাম তোলা আছে।

তারা চলে গেলে মল্লিকার নির্বুদ্ধিতা নিয়ে খুব খানিকটা আলোচনা ক'রে সুকোমলরা উঠে পড়ল। পলাশ যাবার মুখে বললে,—দেখ স্বাধীনতা একটা ফুলের মালা নয় যে গলায় পরে ফেললেই হলো। দেবে পুরে একদিন হাজতে, তখন স্বাধীনতা বেরুবে।

রুমা শান্ত স্বরে বললে,—তোমার জানলা খুলে যদি মুন্সি ঢুকে আশ্রয় চাইত, তাহ'লে তুমি নিজে কি করতে?

পলাশ একটু ভেবে বললে,—মল্লিকার মতোই করতাম বোধ করি।—ব'লে একটু হাসল।

তখুনি মল্লিকার মনের সব গ্লানিটুকু কেটে যায়। সমস্ত অন্তঃকরণ উল্লসিত হ'য়ে ওঠে। মল্লিকার বন্ধু পলাশ, মল্লিকার মতো ক'রে ভাবে যে পলাশ।

ওরা চলে গেলে শ্যামলীর ভয় দূর করতে হয়। মল্লিকা বলে,—ভারী অদ্ভুত তো মুন্সি! মিছিমিছি পালিয়ে বেড়ায় কেন? পুলিশের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায় ব'লেই ওরাও আরো নজরে নজরে থাকে।

শ্যামলী বললে,—পালিয়ে বেড়ায় না, দিদি, ওকে তাড়িয়ে বেড়ায়।

—কে ওকে তাড়িয়ে বেড়ায়?

শ্যামলী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে,—ওর অদেষ্ট। দাদা তো একেবারে মন্দ নয়, ওকে ইস্কুলে দিয়েছিল। ঐ বটতলার ইস্কুলে, তা চিন্তাহরণ মাস্টারকে মেরে ধরে পালিয়ে গেল। সাতদিন ছোড়দার খোঁজই নেই। পাড়ার লোকে বৌদিদিকে মন্দ বলতে লাগল, বৌদিদির তাগাদায় দাদা তাকে খুঁজে ধরে নিয়ে এল। আর ইস্কুলে গেল না। কাজে লাগিয়ে দিল বরফ-কলে, সেখান থেকেও পালিয়ে এল। হাত-কালো-হওয়া কাজ নাকি করবে না। ঘানিতেও কিছুতেই গেল না। অথচ কেমন শখের প্রাণ, এদিকে হাতে একটা কাণাকড়ি নেই! অদেষ্ট ছাড়া আর কি দিদি!

এমনি ক'রে আরো ক'টা দিন কেটে যায়। শ্যামলী যন্ত্রের মতো কাজ করে যায়, কাজে তার কোনো খুঁত থাকে না। মল্লিকার ভালো লাগে না, মিমিদিদের মতো পরের ব্যাপারে নাক ঢোকানো তার স্বভাব। কোথায় গেল মোহন? মোহনের দাদা পদ্মর বাবার সঙ্গে অনেকদিন কথাবার্তা এগিয়ে রেখেছিল, এই সময় মোহনের গঙ্গাসাগর যাওয়ার কোনো মানেই কেউ খুঁজে পেল না।

পদ্ম এক রবিবারে সকালের দিকে সেজেগুজে এ বাড়িতে এল। শ্যামলী আধময়লা শাড়ির আঁচলখানি কোমরে জড়িয়ে রান্না করছিল, এমনি সময় সুগন্ধি তেল দিয়ে মোলায়েম ক'রে চুল আঁচড়ে, টান ক'রে একটা 'বিয়ের-বাগান' খোঁপা বেঁধে, তার উপর সোনা-বাঁধানো চিরুণী গুঁজে, হাতে অনন্ত পরে, লাল ডুরে তাঁতের কাপড় পরে পদ্ম এসে রান্নাঘরের বাইরে নতুন সবুজ স্যাণ্ডেলজোড়া খুলে রেখে, চালের বাক্সের উপর বসেই নাক সিঁটকে বললে,—ইস্, কি জলকাদা তোমাদের রান্নাঘরে, শামলিপিসি! দেখ আমার নতুন কাপড়ের পাড়ে কাদা লেগে গেল!

পদ্ম ইচ্ছে ক'রে পাড়টি তুলে ধরে শ্যামলীকে লাল সবুজ ফুল-পাতার নক্‌শা-তোলা ফিকে নীল পেটিকোটখানি দেখিয়ে নিল।

শ্যামলী মাছ ভাজছিল। সেদিকে একবার চেয়ে সংক্ষেপে বললে,—দেখ্, বেশি আদিখ্যেতা করিসনি, ঠ্যাং তুলে বোস্। নয়তো খাটো ক'রে কাপড় পর্।

তারপর মাছগুলো উল্টোতে উল্টোতে আবার বললে,—ওসব লাল নীল ফুল-কাটা সায়া পাড়াগেঁয়েরা পরে। মল্লিকাদিদি একরঙা ছাড়া পরেই না।

পদ্ম নাকটা আরেকটু উঁচু ক'রে তুলে বললে,—বাবা বলছিল, যা তোর শামলিপিসীকে একবার দেখে আয়, লোকের বাড়ি চাকরের কাজ করার মতো দুঃখু আর নেই। তা কি আর করবে শামলি! স্বামীটাকে খেয়েছে, বয়সও হ'য়ে যাচ্ছে, তবু এতদিন দাদার পয়সায় দু' থালা ক'রে ভাত গিলেছে, তাই গতরটা রয়েছে—

শ্যামলী খুন্তি হাতে পদ্মর কাছে এসে শান্ত স্বরে বললে,—চা খাবি? মিষ্টি বিস্কুট খাবি? নোন্‌তা বিস্কুট খাবি?

পদ্ম হঠাৎ চালের বাক্স থেকে উঠে পড়ে দরজার দিকে এগোয়।—থাক শামলিপিসী, তুমি কেমন আছ দেখে গেলাম, বাবার শরীরটা তেমন ভালো নেই—

শ্যামলী হেসে ফেলে।—নারে পদ্ম, তোর কোনো ভয় নেই। বোস্, একটু চা খেয়েই যা। তা হ'লে আমিও একটু খাই, দিদিকেও একটু দিই। শোন্, মোহনের খবর পাস?

পদ্ম মাথা নাড়ে, তারপর নিচু গলায় বলে,—শামলিপিসী, মুন্সিকাকা একদিন এসেছিল। ওর কি হবে শামলিপিসী?

শ্যামলীর হৃদয়ের মধ্যে হাতুড়ির বাড়ি পড়ে।—ছোড়দার জন্য তোর কি মাথাব্যথা রে?

পদ্মর সব গর্ব ভেঙে যায়, ঝরঝর ক'রে সে কাঁদতে থাকে।

শ্যামলীর মনের মধ্যে একটা মানুষ বললে বাঃ! এই তো ভালো! মোহনের ভাগীদার থাকবে না কেউ।

আরেকটা মানুষ বললে, মুন্সি! মুন্সি তো এর জীবনটা নষ্ট ক'রে দেবে!

শ্যামলী বললে,—শোন্ পদ্ম, ছোড়দা তোকে যাই বুঝিয়ে থাকুক, ওর কথা ভুলে যা। তোর বাবার কথামতো মোহনকে বিয়ে কর্। মোহন তোর বাবার কাঠগুদাম আগলাবে, সুখে থাকবি তোরা। জানিস্, ওর কুষ্ঠিতে জলে ডুবে মরার ভয় লেখা আছে, জল থেকে ওকে সরিয়ে দে।

পদ্ম অবাক হ'য়ে শ্যামলীর মুখের দিকে চায়।

বাইশ

রাঙাদিদিমণি মিহি তসরের চাদরে ঢাকা পা দু'খানি সরিয়ে বললেন,—আয়, এইখানে বোস্ রে মল্লিকা, তোদের বাড়িতে নাকি চোর ঢুকেছিল?

মল্লিকা অবাক হ'য়ে বললে,—কই না তো কে বলেছে?

—দেখ, আমার কাছ থেকে লুকোসনি, মল্লিকা, রুমা আর পলাশ গল্প ক'রে গেছে। বলিহারি তোর সাহস!

অপ্রসন্ন কণ্ঠে মল্লিকা বলে,—মোটেই চোর ঢোকেনি রাঙাদিদিমণি, আমাদের শ্যামলীর ছোড়দা বড় ভাই-এর সঙ্গে মারামারি ক'রে বোনের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। পাড়ার লোকের ভয়ে আমাদের বাড়িতে এসে যে লুকিয়েছে, তাকে কি আমি তাড়িয়ে দেব, না পুলিশে ধরিয়ে দেব?

উৎসাহিত হ'য়ে রাঙাদিদিমণি উঠে বসলেন,—নাকি দারুণ ভালো দেখতে?

—কে বলেছে?

—চটে যাচ্ছিস কেন? রুমা বলেছে।

মুন্সির পাতলা অসন্তুষ্ট মুখখানি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।—আবলুশ কাঠের মতো রঙ ভালোই দেখতে। তবে কি জানো রাঙাদিদিমণি, কি রকম একটা খুঁতখুঁতে ভাব, সব সময় অসন্তুষ্ট, কিচ্ছু খায় না, কিন্তু সমস্তক্ষণ যেন ক্ষিদে লেগে রয়েছে।

—মনের মতো খাবার জিনিস দিলে হয়তো মুখে রুচত, কিন্তু ছোটলোকদের লাই দিতে নেই, মল্লিকা, মাথায় চড়ে বসবে। আমরা যখন ছোট ছিলাম, টিলির পিসির না ওর মা-র পিসির কার যেন খাটের তলায় চোর ঢুকে লুকিয়ে বসেছিল, তা ও চেঁচিয়ে-মেচিয়ে একাকার কাণ্ড করেছিল; শেষটা কি যেন হয়েছিল মনে পড়ছে না।

রাঙাদিদিমণির কথা অস্পষ্ট হ'য়ে আসে। অসংযত অতীতকাল হুড়মুড় ক'রে এসে তাঁকে গ্রাস করে।

রুমা বলেছে। রুমা তো সেদিন যায়নি। পলাশ রুমাকে বলেছে, তারপর দু'জনে রাঙাদিদিমণিকে হাসাবার জন্য তাঁর কাছে গল্প করেছে।

রাঙাদিদিমণি অতীতের অগাধ সাগরজল থেকে মুখ তুলে বললেন,—জানিস মল্লিকা, সে সময় পুরুষেরা ভারী খারাপ ছিল। কিন্তু কেউ কিচ্ছু মনে করতো না। তবে মেয়েরা একটু এদিক ওদিক করেছে তো সর্বনাশ। আমার বাবার ল্যাণ্ডো ক'রে আমরা লোরেটোতে যেতাম, আর বাবার বন্ধু প্যারী ডাক্তারের ছেলে ক্যামাক ষ্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতো রোজ। সে কি তার সাজ! আমার সঙ্গে আমার আয়া যেতো, তা একদিন সেই ছেলে—তার নামটা কিছুতেই মনে পড়ছে না—একটা গোলাপী রঙের চিঠি ছোট্ট ক'রে ভাঁজ ক'রে গাড়ির মধ্যে ছুঁড়ে দিল। আমার আয়া সেটি কুড়িয়ে নিল, আমি নাক তুলে বসে রইলাম, বিকেলে মা-র সে কি রাগারাগি! কে এই ছেলে? তারপর পরিচয় শুনে একেবারে জল! 'ছেলে-ছোকরারা একটু ঐ রকমই হয়! স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বড় ছেলেটি কি কম পাজী, অথচ কেউ বলতে পারবে না সে লোক খারাপ'। উঠছিস্ কেন মল্লিকা? কাছে ঘেঁষে বোস্, আজকাল আমার শরীর থেকে শীত কিছুতেই যায় না। জানিস্, আমরা কলকাতা শহরে শীতকালে পাখির পালকের 'বোয়া' নিয়ে বেড়াতাম, আর শাড়ির সঙ্গে লম্বা ল্যাজওয়ালা লেসের ছোট্ট মিষ্টি টুপি পরতাম?—যাস্ না মল্লিকা, আমার কথা বলবার লোক নেই।

মল্লিকার মন করুণায় ভরে যায়, রাঙাদিদিমণির পাশে ছোট্ট গোল একখানি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে, তাঁর ছোট্ট ফর্সা হাতখানি নিজের হাতে তুলে নেয়। পাখির পায়ের কথা মনে হয়। ডালে বসবার সময় পাখি যেমন আঙুল দিয়ে ডাল আঁকড়ে বসে, রাঙাদিদিমণি তেমনি ক'রে মল্লিকার হাত আঁকড়ে ধরেন। যেন ছেড়ে দিলেই অগাধ সমুদ্রের জলে তলিয়ে যাবেন!

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থাকতে পারেন না রাঙাদিদিমণি, অনর্গল কথা বলে যান, যেন ভয় হয় বুঝি সব কথা আর বলা হবে না। বলেন,—আমার বাবা বাড়িতেও আমাদের সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বলতেন। মাকে ইংরিজি শেখাবার জন্য মেম রেখেছিলেন, মা নানান অছিলা ক'রে একজনের পর একজন মেম তাড়াতেন, আর বাবাও অমনি কোত্থেকে একজনের পর একজন সুন্দরী মেম ধরে আনতেন। সে এক মজা ছিল। আমার মনে আছে,—আচ্ছা, ঐ দেরাজটা একবার খোল তো।

মল্লিকা দেরাজ খুলে রাঙাদিদিমণিকে একটা পুরানো জাপানী বাক্স বের ক'রে দেয়।

—চশমাটাও দে, মল্লিকা।

চশমা পরে রাঙাদিদিমণি বাক্স থেকে ষাট বছরের ধনসম্পদ বের করেন, হলদে-হয়ে-যাওয়া চিঠি, ফিকে-হ'য়ে-যাওয়া ছবি, রঙিন ফিতে দিয়ে বাঁধা কোথাকার কোন্ ভোজের মেনু কার্ড, ছোট একগুছি ল্যাভেণ্ডারের ফুল, কাগজের মতো পাতলা ফুরফুর করছে, একটা কালো-হ'য়ে-যাওয়া গিল্টি-করা লেস-পিন। রাঙাদিদিমণি সেটি তুলে ধরে বললেন,—দেখ, খৃষ্টমাস ক্র্যাকারের মধ্যে এই সব থাকতো, আর খুদে খুদে জাপানী ছাতা, আরো কত কি। জানিস্, আমাদের বাড়িতেও খৃষ্টমাস পার্টি হতো। প্লাম পুডিং হতো, তার মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট রুপোর আংটি, বুট জুতো, থিম্বল্ এই সব পুরে দেওয়া হতো। যে আংটি পাবে, বচ্ছর না ঘুরতে তার বিয়ে হ'য়ে যাবে; যে বুটজুতো পাবে তাকে ভ্রমণ করতে হবে আর যে থিম্বল্ পাবে তার বিয়েই হবে না।

রাঙাদিদিমণির মুখখানি সেই সব অতীতকালের খৃষ্টোৎসবের চীনে লণ্ঠনের আলোতে উজ্জ্বল মনে হয়।

—জানিস্, মল্লিকা, কোনো উৎসব হ'লেই রাণার বাবা প্রদ্যোৎ আসতো আমাদের বাড়িতে। এখন মনে পড়ছে, ও-ই দিয়েছিল ঐ পিনটা আমাকে, তাই রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু জানিস্, শেষটা ভারী খারাপ ব্যবহার করেছিল। আমার বাবা ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন, ক্যাড্, বাউণ্ডার, আরো কত কি! কিন্তু কি জানিস্ মল্লিকা, আজকাল আর কিছুতেই প্রদ্যোতের মুখটা মনে করতে পারি না। তবে খুব ভালো দেখতে ছিল, এটুকু মনে আছে। দেখতেও ভালো আর টাকাও ছিল মেলা। কিন্তু তাতে আর কার কি হলো!

মিনামাসিমাও এসে বসেন, বাক্স নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, সত্যিই একটা ছোট্ট রুপোর থিম্বল্ বের করেন।

—মা সেই গোঁফওয়ালা মিস্ গাঙ্গুলীকে মনে পড়ে? খুব হাসেন মিনামাসিমা। এই দেখ সেই থিম্বল্, যা নিয়ে অত কাণ্ড হয়েছিল।

রাঙাদিদিমণি মনে করতে পারেন না।—কে মিস্ গাঙ্গুলী?

—আরে সেই যে তোমার কম্প্যানিয়ন্ ছিল কিছুদিন, আমাকেও পড়াত। মনে নেই তুমি যখন স্বদেশী হ'য়ে বায়না ধরলে মেম ঢুকতে দেবে না বাড়িতে, বাবা রেগেমেগে মিস্ গাঙ্গুলীকেই নিয়ে এলেন। কি বলো মা! তাও ভুলে গেলে? তোমার ফিরিঙ্গী কায়দায় স্বদেশী হওয়ার যে খুব খ্যাতি ছিল!

রাঙাদিদিমণি কোনো কথা ভুলে যেতে চান না, বুকের মধ্যে সব জমা ক'রে রাখতে চান। বিরক্ত হ'য়ে ওঠেন,—কি যে বলিস্ মিনা, আমার নিজের ছোটবেলার কথা সব পরিষ্কার মনে পড়ে, আর তোর ছোটবেলা ভুলে যাব। মিস্ গাঙ্গুলী বলে কাউকে আমার মনেই পড়ে না।

কিছু থেকে রাঙাদিদিমণি বাদ পড়তে চান না, অতীতের কোনো কিছু হাতের ফাঁক দিয়ে ঐ বুঝি গলে গেল মনে করতে তাঁর অসহ্য লাগে। অপ্রসন্ন কণ্ঠে বলেন,—আচ্ছা বল-ই না, মিস্ গাঙ্গুলীর কি হয়েছিল।

—সেই যে খৃষ্টমাস পার্টিতে এই থিম্বল্ গিয়ে পড়ল মিস্ গাঙ্গুলীর প্লেটে। সকলের সে কি হাসি। আর মিস্ গাঙ্গুলী রেগে কেঁদে থিম্বল্ ছুড়ে ফেলে একেবারে কাজ ছেড়ে চলে গেল। সব ভুলে গেলে! গোঁফওয়ালা মেয়ের আবার বিয়ের আশা ভেবে সকলে হেসে কুটোপাটি!

রাঙাদিদিমণির এতক্ষণে মনে পড়ে।—না, ভুলে যাইনি, হঠাৎ মনে করতে পারছিলাম না। যাবার সময় আমাকে কি না ব'লে গেল। বিয়ে-না-হওয়ানের নিয়ে হাসতে হয় না।

মিনামাসিমা ছোট্ট রেশমী থলির মুখের দড়ি ঢিলে ক'রে চশমা আর ক্রুশ বোনা বের ক'রে আলোর কাছে বসে পড়লেন।—বিয়ে না হ'লে মেয়েদের মাত্রজ্ঞান থাকে না। দেখিস্, মল্লিকা, সাবধানে থাকিস।

নিজে ছাড়া মল্লিকাকে কেউ কিছু বললে রাঙাদিদিমণি সইতে পারেন না।—কেন? ওর বিয়ে হবে না বল্‌তে চাস না কি? তোর রুমার মতো সুন্দরীদেরই বিয়ে হওয়া মুশকিল, ঠগ বাছতে গাঁ উজোড় হ'য়ে যায়। কি এমন মন্দ দেখতে মল্লিকা?

কাষ্ঠ হেসে মিনামাসিমা বললেন,—তোমার তো সব তাতেই বিরক্ত লাগে। তা ছাড়া সে জন্যও বলছি না। বেশি চালাক মেয়েদের কেউ বিয়ে করতে চায় না।

—তোরই বা বিয়ে হ'য়ে কি এমন ভালোটা হয়েছিল শুনি? সাতটা বছর চুলোচুলি ক'রে কাটালি, তারপর তাকে দেশছাড়া ক'রে তবে থামলি! তুই আর বলিস্ না!

মিনামাসির অধররেখা কঠিন হ'য়ে ওঠে।—তুমিও বাবাকে কম জ্বালাওনি! এক মুহূর্ত শান্তিতে থাকতে দিয়েছিলে কখনো?

রাঙাদিদিমণি ক্লান্তভাবে পাশ ফিরে দেয়ালের দিকে শোন।—কি জানি, তোর বাবার কথা আমার একটুও মনে পড়ছে না। রাণার বাবা তো কি সুন্দর ছিল, তার মুখটাই মনে পড়ছে না। নিয়ে যা বাক্সটা, ফেলে দে। ওসব কেন রেখেছিলাম ভেবে পাচ্ছি না।

অবুঝ ছোট মেয়ের মতো রাঙাদিদিমণি পা দিয়ে বাক্সটা ঠেলে দেন। বাক্সটা নিচে পড়ে যায়, ডালাটা ভেঙে আল্‌গা হ'য়ে যায়। রাঙাদিদিমণি কুশনে মুখ গুঁজে বলেন,—আমার খিদে পেয়েছে, বিকেলে সুন্দরী আমাকে দুধ দেয়নি।

সুন্দরী আপত্তি করে,—ও মা! সে কি বড় মা! চারটের সময় না দুধ দিয়ে বিস্কুট দিয়ে খেলে। বলো তো তোমার রাতের খাবারটি একটু শীগ্‌গীর ক'রে এনে দিই।

ততক্ষণে রাঙাদিদিমণির চোখে জল এসে গেছে।—না, আমাকে বিকেলে দুধ দিস্‌নি, কক্ষণো দিস্‌নি।

আর বসে থাকতে পারে না মল্লিকা। নিঃশব্দে বিদায় নেয়। সিঁড়ি দিয়ে এত তাড়াতাড়ি নামে যে পলাশ রুমাকে দেখতে পায় না। পলাশ ওর হাতখানি ধরে ফেলে,—কি হয়েছে মল্লিকা?

মল্লিকার বুকের রক্ত জল হ'য়ে যায়। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে,—কই কিছু না তো। পলাশের অনাদর সহ্য হয়, কিন্তু আদর সইবে কেমন ক'রে?

তেইশ

অমন ক'রে গল্প করার ঐ ছিল শেষ দিন। তারপর-ই একটা ছোটখাটো পারিবারিক ঝড় বয়ে গেল। পলাশের পাঁচ মাস শেষ হ'য়ে এসেছে, মিনামাসিমার ধৈর্যও তাই। এবার একটা খোলাখুলি কথা হওয়া দরকার।

মিনামাসিমা চিরকালই নিজের আধুনিক মনোভাব নিয়ে গর্ব ক'রে এসেছেন। তবু বলতে তো কেউ তাঁর বিরুদ্ধে একটি কথা। চিরদিন মিনামাসিমা সুশ্রী অথচ শিক্ষিত ভদ্র-মহিলার উপযুক্ত কাপড়জামা পরে ভাগ্যের সব জলঝড় মাথা পেতে নিতে পেরেছেন।

কোনোদিন গলাটি উঁচু ক'রে প্রতিবাদ করেননি। তা ছাড়া এত সব পরীক্ষার মধ্যেও ভগবানে বিশ্বাস হারাননি। দিয়েছেনও ভগবান প্রচুর; অঢেল টাকা-পয়সা, সময়-সুযোগ; তবে মাঝে মাঝে যে অদ্ভুত আচরণও করেননি তাও নয়; কিন্তু তাঁর অভিসন্ধি দুর্বোধ্য দুর্জ্ঞেয় হ'লেও মিনামাসিমা রোজ রাত্রে শোবার আগে লম্বা-হাতা গলা-বন্ধ রাতকামিজ পরে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করতে ভোলেননি। মানুষের প্রতিও যথাসম্ভব তাঁর কর্তব্যপালন করেছেন। আর শুধু কর্তব্য কেন, তার চেয়েও অনেক সময়ে অনেক বেশি করেছেন। রুমাকে যত্ন ক'রে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে মানুষ করেছেন। অন্তত চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এত সবের প্রতিদান আর সেরকম কোথায় পেলেন? অবশ্য প্রতিদানের আশায় কিছু করেছেন, এ কথা যেন কেউ মনেও না করে। মা-র কথাই ধরা যাক না। আজ পনেরো বছর ধরে মার কি কম সেবা-যত্নটা করেছেন মিনামাসিমা। মা-র মতো অবুঝ মানুষের তদারক করা যে কি ব্যাপার যে দেখেনি তাকে বোঝানো সম্ভব নয়। বুড়ো হ'তে মা জানেন-ই না। সব বিষয় একটা আহ্লাদে দশ বছরের মেয়ের মতো করেন। অথচ ওদিকে চনচনে বুদ্ধি। এক কলমের আঁচড়ে যে মিনামাসিমা আর রুমাকে পথে বসানো যায় সে জ্ঞানটি ঠিক আছে।

রুমাও যেন কি! কেয়ার-ই করে না। সাজে গোজে, বেড়ায় কুড়োয় বটে, কিন্তু মিনামাসিমার অনেক সময় মনে হয় এ সব জিনিসের ওর কাছে এক কানাকড়িও দাম নয়। পাচ্ছে তাই নিচ্ছে। না পেলেও কিছু ওর এসে যাবে না। সিল্ক ছেড়ে সুতি পরে বেড়াবে। তবু ঐ রকম সুন্দর দেখাবে। ফিরিঙ্গী মেয়েদের সঙ্গে সারাজীবন লেখাপড়া শিখেছে, অথচ কোনো ছলাকলাও জানে না। অর্থাৎ জানে সব-ই কিন্তু কেয়ার করে না।

মা আর রুমা, দু'জন দুই ধরনের লোক। কিন্তু কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য আছে। মা সব চান, কিন্তু বোধ হয় কিছুই পছন্দ হয় না। রুমার সব পছন্দ হয়, কিন্তু বোধ হয় কিছুই চায় না। তবু মিল আছে।

কিন্তু এ রকম ক'রে ক'দিন চলে। রুমার সমবয়সীদের সব কবে বিয়ে হ'য়ে গেছে। মিনামাসিমা হিসাব ক'রে দেখেন রুমার তেইশ বছর হলো। তেইশ বছর! এর আগে কত ভালো ভালো সম্বন্ধ মিনামাসিমা ফিরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আজকাল একটু ভাবনা হয়। না হয় কেউ-ই রুমার ঠিক উপযুক্ত নয়, কিন্তু ওর-ই মধ্যে বেছে নিতে হবে তো। পলাশ খুব ভালো ছেলে, ভালো বংশ, উচ্চ শিক্ষিত, তা না-ই বা গেল বিলেত, টাকার তো অভাব নেই, পরে একবার ঘুরে এলেই হবে এখন, দেখতে শুনতেও খাসা। প্রথম যখন এসেছিল ওর মফঃস্বলী কাঠ-কাঠ ভাব দেখে, সত্যি কথা বলতে কি, মিনামাসিমা কতকটা হতাশ হয়েছিলেন। রুমার সঙ্গে এ ছেলেকে মানাবে কেন! কিন্তু পাঁচ মাস না কাটতে ওর হাল-চাল বেমালুম বদ্‌লে গেছে। এখন রুমার পাশে বেশ দেখায়।

জ্যাঠার বাড়িটা পাঁচ শো টাকায় ভাড়া হলো। মন্দ কি? আগ্রা কলেজের কাজটা রয়েছে, পত্রিকাটা থেকেও নাকি একটু-আধটু হয়—ব্যাটা ছেলেদের কাজ-কর্ম থাকা ভালো। পুরুষ মানুষরা যে সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, অবসন্ন শরীরে সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফেরে, সাংসারিক সুখ বজায় রাখবার এই হলো প্রধান সহায়। যাদের হাতে সময় থাকে, তারা কখনো স্ত্রীদের ভালোবাসে না। তবে কি না বেশি বেশি ভালোবাসাও ভালো না, ওতে স্ত্রীদের মনের প্রসারতায় অনেক সময় হস্তক্ষেপ করা হয়—মিনামাসিমা নিজের কাছেও কথাটা ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলতে পারে না। যাই হোক, আজ সন্ধেবেলা পলাশ এলে কথাটা পাড়তে হবে।

মা-র ঘরে পাড়াই ভালো। হাজার হোক তিনিই এ বাড়ির মাথা। কথাটা একবার তুললে তিনিই অনেকখানি এগিয়ে দেবেন, কারণ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মা-র সব লজ্জা-সরমের বালাই ঘুচে গেছে, আজকাল মা ভারী স্পষ্ট কথা বলেন। সব সময় অতটা না বললেও পারেন। মাঝে মাঝে ভুলে গিয়ে বাজে কথাও বলেন, যে সব ঘটোন কিন্তু মা ভেবেছেন যে ঘটেছে, কিংবা কোনো সময় মা-র ইচ্ছা হয়েছিল যে এমনি সব ঘটুক, সে সব কথা নিয়েও আজকাল মহা তর্ক করেন। চারদিকে মুশকিল।

মিনামাসিমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবেন, তবু মা-র ঘরেই কথাটা হওয়া ভালো। আশা করি রুমা কোনোরকম বাগড়া দেবে না। আশ্চর্য মেয়ে রুমা, পলাশের সঙ্গে এত ভাব, কিন্তু কোথাও একটু রোমান্স তো চোখে পড়ে না। তা ছাড়া অতটা বন্ধুত্ব না হলেই ভালো ছিল, এটা মিনামাসিমারই ম্যানেজমেণ্টের ত্রুটি। বিয়ের গোড়াতে একটু প্রেম থাকা ভালো, তা হ'লে গুছিয়ে বসবার সুবিধা হয়। কিন্তু এত বেশি বন্ধুত্ব হ'লে প্রেম হওয়া শক্ত। যেমন মল্লিকার সঙ্গে সকলের এত বেশি বন্ধুত্ব যে আজ পর্যন্ত কারো সঙ্গেই প্রেম হলো না। অবিশ্যি রুমার সঙ্গে মল্লিকার কোনো তুলনা-ই হয় না। রুমার অত রূপ আর এত সম্পত্তির আশা কিছু ফেলে দেবার মতো জিনিস নয়। অবিশ্যি পলাশের নিজেরও যথেষ্ট রয়েছে, শুধু ব্যাকগ্রাউণ্ড নেই।

মিনামাসিমা সোজা হ'য়ে উঠে বসেন। পলাশের ব্যাকগ্রাউণ্ড নেই? রাণার ছেলে পলাশের ব্যাকগ্রাউণ্ড নেই? রাঙাদিদিমণির মতো মিনামাসিমাও কি তবে মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন নাকি? রাণাকে বিয়ে করবার জন্য কলকাতা শহরের আধুনিকারা কতই না ফাঁদ পেতেছিল, মিনামাসিমাকে কত ঈর্ষাবাণ বুকে পেত গ্রহণ করতে হয়েছিল। ভিক্টোরিয়ান ফ্যাশানের আঁটো জামায় আবদ্ধ মিনামাসিমার উদ্বেলিত হৃদয়ের সে মধুময় গাঢ় বেদনার কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। রাণা। আজ পর্যন্ত রাণার মতো কাউকে দেখলেন না মিনা-মাসিমা। অথচ কি অবলীলাক্রমে সুড়সুড় ক'রে গিয়ে সে সীমাকে বিয়ে ক'রে ফেলেছিল। মিনামাসিমাকে একটু লড়াই করবারও সুযোগ দেয়নি। খবর পেতে না পেতে গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেছিল! না, পলাশকে ছেড়ে দেওয়া হবে না। আজই যা হয় একটা ক'রে ফেলতে হবে।

মা-র ঘরে রুমা বসে মা-র সঙ্গে দেখা-বিহিত খেলছিল। ভালোই হলো। পলাশ এসে পৌঁছবার আগে রুমার সঙ্গে কথাটা ব'লে নেওয়াই ভালো। মেয়ের মতামত না নিয়ে সেকেলে হিন্দুবাড়ির মতো মিনামাসিমা রুমার বিয়ে দিয়ে দিলেন, একথা কেউ যেন বলতে না পারে!

মিনামাসিমা বললেন,—রুমা, আজ পলাশ আসবার কথা না?

—আসবে মা, তাই বলেছিল। কিন্তু কি জানো, ওর বন্ধু শম্ভু সরকার বিপাশাকে বিয়ে করতে চাইছে, তা বিপাশা কিছুতেই রাজী হচ্ছে না, তাই নিয়ে ওরা ভারী বিব্রত।

মিনামাসিমা বিস্ময় প্রকাশ করেন।—কেন, রাজী হচ্ছে না কেন? বিপাশা তো আর মোর‍্যালিটির ধার ধারে না, ঐ রকম লোকই তো ওর সঙ্গে মানাবে। তার উপর শুনেছি অবস্থাও খুব ভালো, নতুন গাড়ি কিনেছে দেখলাম। বিয়ে ক'রে ফেললেই পারে। আপত্তিটা কি? ওর দাদা-বৌদি তো হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। ওকে বোলো, এই ওর শেষ চান্স, অমন একটা ক্যাচ্ চিরদিন ওর পেছন পেছন ঘুরবে না। তুমিও তাই মনে রেখো।

রুমা এমনি অবাক হ'য়ে গেল যে আরেকটু হ'লেই চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিল।—আমি,

মা? শম্ভু সরকার আমাকে বিয়ে করবে কেন, ও তো বিপাশাকে বিয়ে করতে চায়।

মিনামাসিমা বিরক্ত হ'য়ে বললেন—ঢঙ কোরো না, রুমা, ভালো লাগে না, আমি পলাশের কথা বলছি। মনে করছি আজ পলাশ এলে বিয়ের কথা পাড়ব।

বিয়ের কথা শুনেই রাঙাদিদিমণি হাতের তাস নামিয়ে রেখে চকচকে চোখে মিনা-মাসিমার দিকে তাকালেন। কারো মরার খবর পেলে রাঙাদিদিমণি যেমন উৎসাহিত হ'য়ে ওঠেন, বিয়ের খবর পেলেও তাই।

রুমার মুখ থেকে সব রঙ আর হাসি মুছে যায়।—কিন্তু আমি তো পলাশকে বিয়ে করবো না।

—পলাশকে বিয়ে করবে না? কেন শুনি? এদিকে তো একেবারে হরিহরাত্মা।

রুমা বললে,—ও আমার বন্ধু, কিন্তু ওকে বিয়ে করতে পারব না।

—কেন, পারবে না কেন?

—ওকে আমি সে-রকমভাবে ভালোবাসি না।

মিনামাসিমা কারো খাটে বসা পছন্দ করেন না, তবু রাঙাদিদিমণির পায়ের কাছে বসে পড়ে বললেন,—কোন্ রকম ভালোবাসা তা হ'লে।

—বন্ধুকে যেমন ভালোবাসে। বিয়ে অন্য জিনিস।

দেখ্ রুমা, আমাকে আর বিয়ে শেখাতে আসিস না। একজন ভদ্র শিক্ষিত মেয়ের বিয়ের আগে বন্ধুত্ব ছাড়া আর কি হওয়া উচিত? আর যা হবার বিয়ের পরে হ'লেই তো ভালো।

রুমা তবু মাথা নেড়ে বলে,—ওকে আমি বিয়ে করতে পারব না।

—তবে অত মিশলি কেন ওর সঙ্গে? আর ও-ই বা কি রকম ছেলে? নিজেদের মধ্যেও পাকাপাকি না ক'রেই ও-ই বা রোজ রোজ এত মেলামেশা করলো কেন?

বলতে বলতে পলাশের বাবা রাণার উপর সেই পুরানো রাগটা মিনামাসিমার বুকের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। মিনামাসিমার মুখ রাঙা হ'য়ে উঠল, কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল।

—মা, কেন এত উত্তেজিত হচ্ছ? পলাশ আমার মনের কথা জানে। সে কোনোদিনও এতটুকু অশোভন ব্যবহার করেনি। অশোভন ব্যবহার করা তার পক্ষে অসম্ভব।

মিনামাসিমার মুখে কথা যোগায় না, ঠোঁট কাঁপতে থাকে।

রাঙাদিদিমণি হাতের তাসগুলি গুছিয়ে নিয়ে বললেন,—তুই আর কাউকে ভালোবাসিস্, না রুমা?

রুমা শুধু মাথা নামিয়ে সম্মতি জানায়।

মিনামাসিমা এত আশ্চর্য হ'য়ে যান যে রাগ ভুলে যান। আর কাকে ভালোবাসে? জানাশোনার মধ্যে ভালোবাসার যোগ্য আর কে-ই বা আছে?

রাঙাদিদিমণি দারুণ রেগে যান।—ভালোবাসার যোগ্য? ভালোবাসার আবার যোগ্য-অযোগ্য কি? ভালোবাসার ক-খ-ও তুই শিখিসনি রে মিনা।

—বেশ তাই মেনে নিলাম। কাকে ভালোবাসে ও?

—সুকোমলকে, না রুমা?

মিনামাসিমা লাফিয়ে ওঠেন।—সুকোমলকে? চাল নেই, চুলো নেই, একটা ভালো জামাকাপড় পরে না কখনো, ওর বাবা কোথায় যেন স্কুলমাস্টারি করত, এখন রিটায়ার করেছে; স্কুলমাস্টারের পুত্রবধূ হ'য়ে বাজারের থলে হাতে ক'রে বাজার যেতে পারবে রুমা?

রুমা তার ঈষৎ গোলাপী আভাযুক্ত পদ্মফুলের মতো হাত দু'খানির দিকে চেয়ে বললে,—পারব। সুকোমল একটা জীনিয়াস মা, বেশিদিন কষ্ট করতে হবে না।

তখন রাঙাদিদিমণি চাদর-টাদর ফেলে দিয়ে মহা অনর্থ বাধিয়ে বসলেন।—কেন যাবে ও বাজারের থলি হাতে নিয়ে? আমার সব সম্পত্তি আমি ওকে লিখে দিয়ে যাব। তুই নিজে বাজারের থলি নিয়ে বাজার করবি!

মিনামাসিমা মাথা উঁচু ক'রে বললেন,—তাই বা করব কেন? আমার স্বামী যা রেখে গেছেন তাই থেকে আমার মাসে দেড়-শো টাকা হয়। আমি কল্যাণ সমিতির সেণ্টারের বিনা মাইনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হ'য়ে যাব। আমারো সুবিধা হবে, ওরাও বিনা পয়সায় একটা ভালো লোক পাবে।

রুমা উঠে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে।—মা তুমি কষ্ট পেলে, আমি কি ক'রে সুখী হবো?

—তা হ'লে সুকোমলের কথা ভুলে যা।

কঠিন স্বরে কথাগুলি ব'লে, রুমার বাহুবন্ধন ছাড়িয়ে মিনামাসিমা নিজের ঘরে খিল দিলেন।

চব্বিশ

একটু বাদেই পলাশ উপরে উঠে এসে দেখে রাঙাদিদিমণি রুমাকে জড়িয়ে ধরে হাসি-কান্নায় ভেসে যাচ্ছেন। পলাশ আসতেই দু'জনায় মিলে এলোমেলো ভাঙাচোরাভাবে সমস্ত কাহিনী বিবৃত করলেন। রুমার চোখে জল দেখে পলাশের মনটা কেমন ক'রে উঠল। রুমা বললে—সারাজীবন মা আমার কিসে ভালো হয়, তাই ভেবেই কাটালেন, এখন তাঁর মনে কষ্ট দিতে খারাপ লাগছে।

পলাশ বললে,—ভালো জিনিষের জন্য খানিকটা কষ্ট স্বীকার না ক'রেও চলে না, রুমা।

কুহেলিকাময় অতীত সহসা রাঙাদিদিমণির চোখে স্পষ্ট হ'য়ে গেল। রাঙাদিদিমণি বললেন,—দেখ্ রুমা, মিনার জীবন আর আমার জীবন শুধু ভাগ্যদোষে ব্যর্থ হয়নি। আমরা সব ভালো জিনিস চাইতাম কিন্তু তার জন্য কিছুই ছাড়তে রাজী ছিলাম না। তাই হাত থেকে সব ফসকে গেল। তুই আমাদের চাইতে বুদ্ধিমতী রে!

রুমা যে মাকে ছেড়ে সুকোমলকে বরণ করবে সে বিষয় রাঙাদিদিমণির মনে এতটুকু সন্দেহ নেই।

রাঙাদিদিমণি বলেন,—এক্ষুণি গোপেশ্বরকে ডেকে পাঠা' দিকিনি। আমার উইল বদ্‌লাবো।

রুমা আকুল হ'য়ে ওঠে।—না, না, এক্ষুণি কিছু কোরো না, লক্ষ্মীটি। সকাল হ'লে যা হয় কোরো। সকালে সব অন্যরকম দেখায়।

রাঙাদিদিমণি অনিশ্চিতভাবে চারদিকে চেয়ে বলেন,—কি জানি, যদি সকাল না-ই হয়! রাত্রে মাঝে মাঝে কি রকম মনে হয়, হাত যেন খালি, কিছু যেন করলাম না। আজই তাকে ডাক রুমা।

রুমা রাঙাদিদিমণির পাশে বসে তাঁর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে,—দূর, কি যে বলো? কিছু করলাম না আবার কি কথা! আমাকে সুখী করাটা বুঝি কিছু নয়?

—তা হ'লে অন্তত মল্লিকাকে ডেকে পাঠা'। সে এলে আমার সব অন্যরকম মনে হয়।

—বেশ, তাই ডেকে পাঠাচ্ছি।

মল্লিকাকে আনতে রুমার হাতে-লেখা চিরকুট নিয়ে গাড়ি যায় রামকিষ্টপুর।

পলাশ উঠে দাঁড়ায়,—চলি রুমা, কাল আবার আসব। সুকোমলের হ'য়ে খুশি না হ'য়ে পারছি না। রাঙাদিদিমণি, আমি গেলাম।

রাঙাদিদিমণি বললেন,—তুমিই তো যাবার পথে গোপেশ্বরকে খবর দিয়ে যেতে পারো, যেন কাল খুব ভোরে চলে আসে।

পলাশ হেসে বলে,—সে কি ক'রে হয়, রাঙাদিদিমণি? আমি যাবো টালিগঞ্জ, তিনি থাকেন শ্যামবাজারে।

—আচ্ছা, আচ্ছা, কাল সকালেই খবর দেওয়া যাবে এখন। তবে তুমি ইচ্ছা করলেই যেতে পারতে, ট্রামে ক'রে কিচ্ছু দূর হয় না, এ আমি অনেককে বলতে শুনেছি।

রাঙাদিদিমণির মাথার উপর দিয়ে রুমা আস্তে মাথা নাড়ে, পলাশ বিদায় নিয়ে রওনা দেয়।

রুমা সিঁড়ির মাথা অবধি এসে বললে,—কিন্তু পলাশ, তুমি আমার সঙ্গে প্রেমে পড়লে না কেন? আমি কি যথেষ্ট সুন্দরী নই?

পলাশ বললে,—তুমি বড্ড বেশি সুন্দরী, রুমা, তোমার সঙ্গে যদি বা একটু-আধটু প্রেম করা চলে, বিয়ে করা চলে না।

—কিন্তু সুকোমল তা হ'লে কি ক'রে বিয়ে করবে?

—ওর কথা আলাদা, ও শিল্পী মানুষ, যা দেখে আমাদের চোখে ধাঁধা লেগে যায়, ও তার মধ্যে থেকেও মেলা খুঁত বের করবে, দেখো।

তবু রুমা পলাশকে ছাড়ে না, পাঞ্জাবীর হাতা ছাড়িয়ে পলাশ বলে,—তোমার একা থাকতে ইচ্ছে করছে না ব'লে আমাকেও এখানে দাঁড়িয়ে বাজে বকতে হবে, এ তোমার অন্যায় আব্‌দার, রুমা।

পলাশ চলে গেলে মল্লিকার জন্য ছোট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রুমা ঘরে এসে রাঙাদিদিমণিকে বলল,—তোমার দেরী হ'য়ে গেছে, খাবার দিতে বলি সুন্দরীকে?

রাঙাদিদিমণি বললেন,—আমার তো খাওয়া হ'য়ে গেছে।

—কোথায় তোমার খাওয়া হলো? আমি তো সারা সন্ধে এইখানেই বসে আছি। ব'লে দিই সুন্দরীকে।

রাঙাদিদিমণি হাত বাড়িয়ে রুমাকে খোঁজেন।—আয় কাছে, আয়। মনে হচ্ছে পেট আমার ভরে গেছে, একটুও খিদে নেই, সুন্দরীকে ডাকিসনে, তুই আমার কাছে আয়। আরো কাছে আয়, আমার একলা-লাগা ঘুচিয়ে দে।

শুনে রুমার বুক ফেটে যায়, রাঙাদিদিমণিকে বুকে জড়িয়ে ধরে থাকে। এমনি সময় গাড়ির শব্দ শোনা যায়। মোড়ের মাথায় মল্লিকার সঙ্গে দেখা, সেইখান থেকে ড্রাইভার তাকে তুলে এনেছে।

মল্লিকা ত্বরিত পদে উপরে উঠে আসে। চোখে-মুখে উদ্বেগের চিহ্ন।—কি হলো রুমা? কেমন আছ, রাঙাদিদিমণি?

—আয় মল্লিকা, রুমার সঙ্গে সুকোমলের বিয়ে।

মল্লিকার মুখ থেকে সব রক্ত নেমে যায়। তাহ'লে পলাশের কি হবে?

রুমা কৌতুক-ভরা চোখে মল্লিকার দিকে চেয়েছিল। মুখে কিছু না বললেও মল্লিকার গোপন কথা তার আর জানতে বাকি ছিল না। মল্লিকার সাদা মুখ দেখে আশ্চর্য হ'য়ে গেল রুমা।—তোমার শরীর খারাপ করেছে, মল্লিকা? তবে এলে কেন?

মল্লিকা কম্পিত হাতে মুখ থেকে চুল সরিয়ে বলে,—না, না আমার শরীর ভালো আছে। ড্রাইভার আমাকে আনতে যাচ্ছিল কেন? আমি অবিশ্যি এমনিতেই আসছিলাম।

রাঙাদিদিমণি বললেন,—আয়, তুই কাছে আয়। তোকে আমি ভালোবাসি তা জানিস? রুমা সুকোমলকে বিয়ে ক'রে সুখী হবে শুনে খুশি হোস্‌নি মল্লিকা?

মল্লিকা নিচু খাটের পাশে রাখা গালিচার উপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বলে,—হ্যাঁ খুব খুশি হয়েছি।

—মিনা রেগে গেছে। কাল নতুন উইল ক'রে আমার সব টাকা রুমাকে দিয়ে দেব। খুব জব্দ হবে মিনা।

রুমা কাতর হ'য়ে বলে,—না, না, তা তুমি করবে না। মা তোমার একমাত্র মেয়ে, তাকে তুমি ভালোবাসো না?

রাঙাদিদিমণি বললেন,—প্রদ্যোতের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি, কিন্তু তার চার বছর পরে আরেকটু হ'লে চলেই যাচ্ছিলাম প্রদ্যোতের সঙ্গে। মিনা আমার সঙ্গ নিল ব'লে আর যাওয়া হলো না। ডাক তাকে, সে আমার জীবন ব্যর্থ ক'রে দিয়েছে, তার মতো কাকে ভালোবাসবো রে রুমা!

রুমা এমনি সোরগোল তোলে মিনামাসিমার বন্ধ দরজার সামনে যে নিদারুণ উদ্বেগে তিনি দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন। রাঙাদিদিমণি বলেন,—মিনা আয় আমার কাছে, আমার বড় একা মনে হচ্ছে।

কি যেন দেখলেন শুনলেন মিনামাসিমা রাঙাদিদিমণির চোখে আর কথায়, কাছে গিয়ে গায়ের উপর হাতখানি রাখলেন। রাঙাদিদিমণি অমনি রুমাকে ছেড়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন।

কি ক'রে জানি মল্লিকা বুঝল এই শেষ। এমনি ক'রে ভালোবাসার জয়যাত্রা হয়। জীবনের ছোট ছোট গ্লানিগুলি এমনি করে ধুয়ে-মুছে যায়। লাভ-ক্ষতিগুলো এমনি ক'রে আকিঞ্চিৎকর হ'য়ে যায়।

অদ্ভুত সুন্দর লাগছে রাঙাদিদিমণিকে, সাদা চুলের রাশিতে, সাদা রেশমি শাড়িতে, সাদা বিছানাতে, শুভ্র নিখুঁত মুখখানিতে, সব মিলে চিরজীবন মনে রেখে দেবার মতো একখানি অপূর্ব ছবি। পাতলা হাত দুটি যেন ফুলের পাপড়ি; রাঙাদিদিমণি দার্জিলিং-এর আইরিশ ফুলের মতো শুভ্র, সুন্দর, সৌরভময়।

অদৃশ্য একটা বাতাস বইল, আইরিশ ফুল দুলে উঠল, মিনামাসিমার বুকের উপর পাপড়ি মেলে পড়ে রইল। অপলক নেত্রে সকলে সেই দিকে চেয়ে রইল। শুধু সুন্দরী কেঁদে উঠল।

পঁচিশ

রাঙাদিদিমণি প্রাণপণে জীবনকে আঁকড়ে ধরে ছিলেন বটে কিন্তু বৃন্ত থেকে খসে পড়লেন যখন, তখন দেখা গেল কোনো কিছুর সঙ্গেই তাঁর সত্যিকার যোগ ছিল না। জীবনযাত্রা যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল। পরদিন কল্যাণসমিতির মিটিং ছিল, পাঁচ

সাতজনার চা খাবার কথা ছিল, সেগুলি শুধু বন্ধ রইল।

সারাদিন সকলকে বিব্রত থাকতে হয়েছিল, রুমার সমস্যার কথা রুমার নিজেরও মনে হয়নি। এ বাড়িতে শোক কোনোদিন শোভাযাত্রা করবার সুযোগ পায়নি, শুধু সারাদিন প্রয়োজনের বেশি কথাবার্তা কেউ বলেনি, তবু এত লোকের সমাগম হয়েছিল যে নীরব থাকবারও উপায় ছিল না।

টিলি মলির দলের সকলে এসেছিল, ওদের স্বামীরাও ছিল, বন্ধুবান্ধব কেউ বাদ যায়নি। নিকট আত্মীয়-স্বজন, অন্তরঙ্গ বন্ধু দু'চারজন রাত্রে থেকেও গেলেন। লোড চক্রবর্তী তাঁর গুরুদেবকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। খবর পেয়ে গুরুদেব অন্য অনুষ্ঠান স্থগিত রেখে, অনেক দূর থেকে এসেছেন শুনে মিনামাসিমা সত্যিই কৃতজ্ঞতা অনুভব করলেন। গুরুদেব অনেক সান্ত্বনাবাক্য ব'লে বিদায় নেবার পর, সকলে একসঙ্গে বসে লুচি-তরকারী ফল-মিষ্টি খাওয়া হলো।

সে রাত্রে মল্লিকার রামকিষ্টপুর যাওয়া হয়নি, শ্যামলীর যদি ভয় করে তাই ছোকরা চাকরটাকে রাতে এসে শুতে অনুরোধ করা হয়েছিল। সে ছেলে লোকের অনিষ্ট করতেও যেমন ভালোবাসে, উপকার করতেও তেমনি। এক কথাতেই রাজী হ'য়ে গেল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর রাঙাদিদিমণির বসবার ঘরে বসে কাজকর্মের কথাবার্তা হচ্ছিল, হঠাৎ মিনামাসিমা ব'লে বসলেন,—দুঃখের দিনেও একটা সুখের সংবাদ না দিয়ে পারছি না। রুমার সঙ্গে সুকোমলের বিয়ে স্থির হ'য়ে গেছে। মা শুনে গেছেন, খুব খুশিও হ'য়ে গেছেন, আমিও তাই খুশি হয়েছি।

মিনামাসিমার গলার স্বরে ক্লান্তির চেয়েও প্রসন্নতা বেশি, যেন রাতারাতি কি একটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছেন।

সব চাইতে আশ্চর্য হয় রুমা নিজে। বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে মা-র দিকে চেয়ে থাকে, বড় বড় অশ্রুবিন্দু চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ে। মিনামাসিমা আরো বলেন,—অনেকদিন এ বাড়িতে কেউ সত্যি ক'রে সুখী হয়নি। প্রমোদ হয়েছে প্রচুর, কিন্তু আমার ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত এ বাড়ির কাউকে সুখী হ'তে দেখলাম না। মনে হয় রুমা বোধ হয় সুখী হ'তেও পারে। তোমরা আশীর্বাদ করো যেন সে সুখী হয়।

মিনামাসিমার চোখেও জল দেখা যায়। তাই দেখে আরও অনেকেরই কান্না পায়। পারিবারিক দুর্ঘটনার এই একটা ভালো ফল হয় যে যারা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাচ্ছিল তারাও সহসা পরস্পরের কাছাকাছি এসে পড়ে।

সুকোমল তখন উপস্থিত ছিল না, সারাদিন নানান ব্যবস্থায় সে ব্যস্ত ছিল, কাল রাত্রের কথা এখনো তার কানে পৌঁছয়নি, আর পৌঁছবে কি না সন্দেহ। সকলে আনন্দও প্রকাশ করলো, সুকোমলের সত্যিকার প্রতিভা আছে এ কথাও সকলে একবাক্যে স্বীকার করলো। সকলের সঙ্গেই তার সদ্‌ভাবও আছে, ছেলেটির স্বভাবটি যে বড় মিষ্টি এ বিষয় কোনো সন্দেহ নেই।

দূর থেকে মল্লিকা দু একবার পলাশকে লক্ষ্য করেছিল, কথা বলবার সুযোগ হয়নি। সন্ধ্যাবেলা যে যার বাড়ি চলে গিয়েছে, দিন যেন ডানা মুড়ে এবার বিশ্রাম খুঁজছে।

মল্লিকা আর রুমা সুন্দরীর সাহায্যে রাঙাদিদিমণির বিশাল ঘরের গালচের উপর ঢালা বিছানার ব্যবস্থা ক'রে দিল, সারারাত ঘরে একটা স্তিমিত প্রদীপ জ্বলল। মিনামাসিমার কাজে বড় একটা ত্রুটি দেখা যায় না।

পরদিন ভোরে উঠে রুমার কাছে বিদায় নিয়ে মল্লিকা বাড়ি চলে যায়। আজ আপিশে না গেলেই নয়; কাল যেতে পারেনি, এমনিতেই অনেক ক্ষতি হ'য়ে গেছে। বুকের মধ্যে একটা জায়গা ফাঁকা হ'য়ে আছে। আজ হঠাৎ মনে পড়ছে কতদিন বাড়ি যাওয়া হয়নি, মা-ভাই-বোনদের মুখ দেখেনি। রাঙাদিদিমণির মৃত্যুতে শোক যত না হয়েছে, মনটাকে নাড়া দিয়েছে তার চাইতে বেশি।

শ্যামলীকে কাজের ভূতে পেয়েছে। তাক থেকে, আলমারির মাথা থেকে, জিনিসপত্র নামিয়ে, খাট-পালঙ্ক ঠেলে সরিয়ে, ছোকরা চাকরটার প্রাণ ওষ্ঠাগত ক'রে দিয়ে, শ্যামলী সমস্ত বাড়িখানিকে তকতকে ক'রে পরিষ্কার ক'রে ফেলেছে। ঝকঝকে বাড়িতে মন খারাপ করা শক্ত, তা ছাড়া মল্লিকার মনের ভাবগুলি এমনি এলোমেলো হ'য়ে রয়েছে যে ঠিক সেই মুহূর্তে নিজেকে নিজেই বুঝে উঠতে পারছে না। পাঁচ মাস ধরে মনে মনে যে ক্ষোভ জমা করেছে, গোপনে রুমাকে যে জন্য ঈর্ষা ক'রে এসেছে, তার কোনো কারণই নেই জেনে অবাধ, উল্লাসের বদলে গভীর বেদনায় মন ভরে রয়েছে।

কিন্তু শ্যামলী সমস্ত দরজা জানলা খুলে দিয়েছে, ফিকে সোনালি পর্দা টানিয়ে রেখেছে, রাশি রাশি ফুল-পাতা সংগ্রহ ক'রে এনে ফুলদানিতে সাজিয়েছে। দেয়ালগুলি ঝকঝক করছে, ঘরের মেজে তখনো একটু ভিজে, মল্লিকার মনে আর ক্ষোভ নেই, অভিমান নেই, পলাশের জন্য শুধু সমবেদনায় কানায় কানায় পূর্ণ হ'য়ে আছে।

মল্লিকাদের আপিশে কারো ব্যক্তিগত জীবনের ঠাঁই নেই। যে যার বাড়িঘরের কথা বাড়িতে রেখে আপিশে আসে, আবার বাড়ি ফিরে তুলে নেয়। মাঝখানকার সময়টুকুতে প্রত্যেকে নিজের মতো নিজে বিকশিত হ'য়ে ওঠে, তখন তাদের স্বামী-স্ত্রী, ছেলেপুলে, বাপ-মা, ভাই-বোন কিংবা তাদের প্রতি কোনো কর্তব্যবোধ থাকে না। মল্লিকারও তাই হয়। যখনি অন্যমনস্ক হ'য়ে যায়, তখনি পলাশের জন্য মনটা ব্যথিত হয়ে ওঠে। কিন্তু কাজের মাত্রা আজ এতই বেশি যে অন্যমনস্ক হবার সময় বড় হয় না।

সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে আশ্চর্য হয়, মোটঘাট নিয়ে মিমিদিরা এসে পৌঁছেছেন। একটা খবর নেই কিছু না, তবু ভাগ্যিস শ্যামলীর কি খেয়াল হয়েছিল বাড়িঘর ঝেড়েমুছে রেখেছিল। মিমিদি মল্লিকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমো খান, সোমনাথবাবুও তাকে দেখে আনন্দ রাখবার জায়গা পান না।

সুন্দর সেরেছেন মিমিদি, তবে অমন দুধে-আলতা রঙও সমুদ্রের জলে কালো হ'য়ে গেছে। সোমনাথবাবু হেসে বলেন,—ও কিছু না, মল্লিকা, ভিতরে ভিতরে এখনো ফর্সা আছে।

মিমিদি রেগে বলেন,—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ন্যাকামো বাড়ছে।

বারান্দায় আনন্দের বান ডাকে। মল্লিকার জন্য হাঁড়ি ভরে পাঁড়া এসেছে, খাবেন অবিশ্যি সোমনাথবাবু নিজে, কারণ মিমিদি আর মল্লিকা কেউ-ই মিষ্টি ভালোবাসে না। মল্লিকার জন্য গিরগিটির চামড়ার চটি এসেছে। মিমিদি নিজের চাইতে এক সাইজ বড় দেখে এনেছেন, তবু যেন একটু ছোট হচ্ছে।

—তা হোকগে, মিমিদি, ছোট চটি পরাই ফ্যাশান!

মল্লিকার জন্য সবুজ পাড়-দেওয়া মিহি কটকী শাড়ি এসেছে। মিমিদি ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করেন,—পছন্দ হয়েছে, মল্লিকা, সবুজ পাড় ভালো লাগে? একটা নীলও ছিল, ঠিক এইরকম, কিন্তু আমি ভাবলাম তোমার এইটেই ভালো লাগবে।

মল্লিকা মিমিদিকে আদর ক'রে বলে,—খুব পছন্দ হয়েছে, মিমিদি, সবুজ পাড় আমি সব চেয়ে ভালোবাসি।

সোমনাথবাবুকে জিজ্ঞাসা করে,—আর ঐতিহাসিক উপন্যাসটা, সেটা শেষ হ'য়ে গেছে?

সোমনাথবাবু একটু অপ্রতিভ হ'য়ে যান।—না, মানে, খানিকটা লিখেছি মল্লিকা—। ছেলেমানুষের মতো হেসে ফেলে বলেন,—ইয়ে একেবারে শেষ ক'রে ফেললে তো ফুরিয়েই গেল! তা ছাড়া দুটো একটা বই কন্‌সাল্‌ট করাও দরকার।

মিমিদি বললেন,—বই শেষ করবে কি! তা হ'লে সমুদ্রের দিকে চেয়ে ঢেউ-ভাঙা দেখবে কখন?

মিমিদির মুখের দিকে চেয়ে মল্লিকা ভাবে মিনামাসিমার মুখের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে মিমিদির, মিমিদিও যেন একটা পুরোনো প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছেন। ধীরে ধীরে চোখ ফিরিয়ে মল্লিকা সোমনাথবাবুর দিকে তাকায়। সোমনাথবাবু মল্লিকার কাছে চেয়ার টেনে বসলেন,—আমরা পুরীতে থাকতে খবর পেলাম এঁদের বাদে মিমির স্বামী মারা গেছে। এ কাজটি আগে করলেই পারত। এখন আরেকটা বিধবা বানিয়ে, গুটিচারেক ছেলেপুলে রেখে গেছে মরে।

মল্লিকা জিজ্ঞাসুভাবে তাকিয়ে থাকে, মনে হয় এ কথার একটা অন্তরা আছে নিশ্চয়।

সোমনাথবাবু নিজের হাতের দিকে চেয়ে বলেন,—মিমি কিন্তু আমাকে বিয়ে করতে রাজী নয়।

মল্লিকা বিস্মিত হয়,—কেন মিমিদি?

মিমিদিও লজ্জা করলেন না, সহজভাবে বললেন,—আমার বেশি বুদ্ধি নেই, মল্লিকা, হয়তো ঠিক বোঝাতে পারব না, কিন্তু আমার মনে হয় তা হ'লে ওঁর অমর্যাদা করা হবে।

মল্লিকার মনের সূক্ষ্ম বিচার নীরব হ'য়ে রইল, সব জিনিস সব সময় বলবার নয়। সোমনাথবাবু নীচু গলায় বললেন,—এত ক'রে বললাম, বলে কি না, কি হবে এতে। বললাম, নিদেন আমার মুখাগ্নি করবার অধিকারটা তো পাবে। বলে, কুড়ি বছর ধরে কানায় কানায় ভরিয়ে দিয়েছ, আর নতুন অধিকারের জায়গা নেই।

সোমনাথবাবুর গলাটা একটু ভেঙে যায়, লজ্জিতভাবে একটু হাসেন।—ও কিছুতেই বিয়ে করবে না, মল্লিকা।

মল্লিকার হৃদয়ও কূল ছাপিয়ে ওঠে। মিমিদি প্রসন্ন কণ্ঠে বলেন,—বাঃ, আমরা খাব না? অত বড় চাঁদা মাছ আনা হলো বরফে ক'রে, সে সব কি ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে?

কি জানি কি মনে হয় মল্লিকার, হঠাৎ উঠে গিয়ে সোমনাথবাবুর পায়ের ধুলো নেয়, সোমনাথবাবুও ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। মিমিদির পায়ের ধুলো নেয়, মিমিদি আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে বলেন,—ও আবার কি হলো, মল্লিকা?

ছাব্বিশ

পরদিন সকালবেলায় শ্যামলী তার মাইনে বুঝে নিয়ে নীলাম্বরী কাপড়খানি আর গয়নাগাটি পরে পুঁটলি বগলে বিদায় নিল। মিমিদির বড়ই মায়া লাগছিল, কিন্তু রাখবারও উপায় ছিল না, গফুরের হাতে ও খাবেও না, ছোঁবেও না।

—ও শ্যামলী, অন্য বাড়িতে কাজ করবি? ব'লে দেখব দু' একজনকে?

শ্যামলী মাথা নেড়ে বললে,—দরকার হ'লে বলব এসে বড়দিদিমণি।

—কোথায় যাবি এখন?

—দেখি বৌদিদির কাছে এখনকার মতো যাই তো, তারপর যা হয় একটা দেখে নেব।

মিমিদি বললেন,—ওখানে থেকেই যা হয় কর্ শ্যামলী, আগেও তো ওখানেই ছিলি।

শ্যামলী বললে,—তখন তো জানতাম না, বড়দিদি, নিজের হাতের ভাত কত মিষ্টি।

মুন্সি নাকি একদিন রাত্রে এসে দাদার কাছে টাকা ধার নিয়ে গঙ্গাসাগরে গেছে, আন্দামানে কি জাহাজ যাবে, তাতে যদি সুবিধে করা যায়। পদ্মর বাবা এতদিনে মোহনের আশা ছেড়ে দিয়ে, শিবপুরে পদ্মর বিয়ে ঠিক ক'রে ফেলেছে। ছেলে নাকি খুব ভালো, বাপের পোদ্দারের দোকান আছে। পদ্ম এসে একদিন কাঁদাকাটিও ক'রে গেল। তারপর আবার বলল,—কিন্তু তারা ভারী বড়লোক দিদি, বেনারসী শাড়ি আর সোনার মাকড়ি দিয়ে আশীর্বাদ করবে। আমরা কিছুদিন ক'রে শিবপুরে থাকব, আবার কিছুদিন বাবার কাছে এসে থাকব। বাবা বুড়ো হয়েছে, একা থাকতে কষ্ট হবে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আপিশ থেকে ফিরে মল্লিকা বললে,—এক মাসের ছুটির দরখাস্ত ক'রে দিয়ে এলাম, মিমিদি। অনেক পাওনা আছে, এবার পেয়ে যেতেও পারি।

সোমনাথবাবু বলেন,—মল্লিকা, তুমি ছুটি নিও না, তুমি চলে গেলে আমাদের মন কেমন করবে। তা ছাড়া তুমি না থাকলে আমার উপন্যাস কি ক'রে শেষ হবে?

মিমিদিও ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেন,—আর কি দেবেন তোমার মা আমাদের কাছে থাকতে?

রুমা বলে,—সে কি ক'রে হয়, মল্লিকা, আমার বিয়ের জিনিসপত্র তা হ'লে কি ক'রে কেনা হবে?

মিনামাসিমাও বলেন,—বিয়ের আগে ঠিক ফিরে আসা চাই, মল্লিকা, তুমি ভার না নিলে বিয়েই হবে না।

সুকোমল বলে,—এ খুব খারাপ কাজ করছ, মল্লিকা, এখন আমার মর‍্যাল সাপর্টের সব চেয়ে দরকার, নইলে শেষটা ও যা বলবে সব কিছুতেই রাজী হ'য়ে যাব।

শুধু পলাশ কিছু বলেনি, তার সঙ্গে এর মধ্যে দেখাও হয়নি, সে নাকি দিন পনেরোর জন্য দার্জিলিং গেছে। যাবার আগেও মল্লিকার সঙ্গে দেখা হয়নি। ছোটবেলায় বাড়িতে কোনো ছোটখাট দুঃখ পেলে পলাশ ছুটে যেত মল্লিকাদের কাছে, তারা অজস্র সান্ত্বনা দিয়ে তার মন ভালো ক'রে দিত। মল্লিকা ভাবলে, আমি সেটুকুও রাখিনি, সান্ত্বনার জন্যও এলো না আমার কাছে।

শ্যামলীর বৌদিদি এসে বলে,—শ্যামলী এসেছে এখানে?

—কেন, বাড়িতে ব'লে যায়নি কিছু?

বৌ বললে,—কাল রাতে একবার বলেছিল এখানে আর আমারো মন টিকছে না, আমি থাকলে তোমাদেরো কষ্ট। তারপর আজ ভোরে উঠে দেখি, থানকতক জিনিস পুঁটলি বেঁধে নিয়ে চলে গেছে।

মল্লিকা হেসে বললে,—যাবে আবার কোথায়? মোহনের খোঁজে গঙ্গাসাগর গেছে বোধ হয়।

বৌ বললে,—তাও না দিদি। মোহন তো তিন দিন হলো ফিরে এসেছে। এদ্দিন বাদে

দু'জনার দেখা হলো, তা সে কি ঝঞ্ঝালো সব কথা।

বৌ ছেলে কোলে উঠে পড়ে।—কি জানি, দিদি, নিজের মনের কথা ভাববার-ই সময় পাইনি কখনো, তা পরের মনের দুঃখ বুঝি কি ক'রে। ও মেয়ে সুখী হ'তে চায় না বোধ হয়।

মিমিদি বললেন,—আর তুই? তুই তো একটা ভালো কাপড়ও পরিস না, মাথায় একটু তেল দিয়ে চুলটাও বাঁধিস না, তোর সুখী হবার সাধ নেই?

বৌ একটু লজ্জিত হয়, কপাল থেকে রুক্ষ চুলগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে বলে,—শ্যামলীর দাদা আর তার ছেলেমেয়েগুলো ভালো থাকলেই আমি সুখী। তবে মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু এই সব এঁড়ি-গেড়ি নিয়ে যাই কি ক'রে, তাদের বড় টানাটানি। যাই দিদি, ভাত চাপাতে হবে।

সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এসে বলে,—মোহন খুব রাগারাগি ক'রে গেল, বলে 'তোমরা তাকে যেতে দিলে কেন?' আরে, তুই রাখতে পারলিনে তা আমরা কি করতে পারি? বললে, 'দেখি সে কেমন পালিয়ে বেড়ায়! ভারী অহঙ্কার হয়েছে।' আবার বললে, 'তোমরা তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো না, তাই সে থাকতে পারল না।' কি জানি দিদি, ওদের মন বুঝতে পারি না।

বৌ চলে যাবার পর মল্লিকা অনেকক্ষণ জানলার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। রাঙাদিদিমণির ছোটবেলাকার চীনে লণ্ঠনগুলি জ্বলে জ্বলে শেষটা নাকি নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে ফেলত।

শম্ভু সরকারের সঙ্গে দু'একবার দেখা হ'য়ে গেল, সে বললে,—আমার নতুন শো-হাউস খুব সাক্সেস্‌ফুল হয়েছে, আসবেন নাকি একদিন?

তার উৎসাহ দেখে মল্লিকা বললে,—তা যেতে পারি একদিন।

শম্ভু সরকার বললে,—বুঝলেন বিপাশার ও চাকরীটা খেয়ে দিয়েছি।

মল্লিকা অবাক হ'য়ে যায়। এর নাম নাকি ভালোবাসা।

শম্ভু সরকার বললে,—কি, আশ্চর্য হ'য়ে গেলেন নাকি? যার জন্য যেমন অস্ত্র দরকার হয়। বিপাশার এখনো আমাকে চিনতে ঢের বাকি আছে। আমার একটা বেনামী কারবারে চাকরী পাইয়ে দিচ্ছি এবার, একেবারে ধনে-প্রাণে মারছি না। দেখুন, ওরকম ক'রে তাকাবেন না আমার দিকে। ওকে আমি যেমন ক'রে পারি শায়েস্তা করব। ওর সব ডিফেন্সেস ভেঙে দেব।

মল্লিকা বললে,—তাইতে হার মানবে, বিপাশা সে মেয়েই নয়।

কোমল স্বরে শম্ভু সরকার বললে,—তা'হলে ওর পায়ে গিয়ে কেঁদে পড়ব। তখন কি হবে?

মল্লিকা বললে,—একমাত্র তাতেই যদি কিছু হয়।

মল্লিকা তারপর উঠে যাচ্ছিল, ওর আঁচলের প্রান্তটি ধরে শম্ভু বললে,—তা ছাড়া আপনি নিজেও এমন কিছু দয়াময়ী দুগ্গো ঠাকরুণটি নন যে মনে মনে অন্য লোককে বিচার করবেন।

কাকে বিচার করবে মল্লিকা? মল্লিকার ভালো-মন্দ বোধ গোলমাল হ'য়ে গেছে। যেমন আগ্রায় থাকতে রবি বর্মার ছবি, রবিঠাকুরের লেখা ছাড়া আর কোনো কিছুকে সহজে ভালো বলতে ইচ্ছা করত না, তারপর এখানে এসে এই চার বছরে কাকে যে সুন্দর বলে কাকে যে অসুন্দর বলে সে বিষয় মতামত বদলাতে হয়েছে, এমন কি সুন্দর অসুন্দর ব'লে

আদৌ কিছু আছে কিনা তাই নিয়েও ভাবতে হয়েছে। আগ্রায় থাকতে মনে হতো আর পাঁচজনা যে রকম আচরণ করে তাই বুঝি করা ভালো, ছোটবেলা লোকে যে সব জিনিসকে ভালো ব'লে শুনে এসেছে, তাই বুঝি সত্যি ভালো। এখন মনে হয় পাঁচজনার ভালো-লাগা কি ভালো বলার এক কানাকড়িও মূল্য নেই। আর কখনো মার সঙ্গেও মত মিলবে না। সেই যে টিচার বুড়ো বয়সে বিয়ে করলো ব'লে মা বিদ্রূপ করলেন, মল্লিকার মায়া লাগল; মিমিদিকে মা মন্দ বলেন—ভেবে ভেবে নিদারুণ নৈঃসঙ্গে মল্লিকার হৃদয় ভরে ওঠে। ভালোবাসার মানুষরাও সে নৈঃসঙ্গ দূর করতে পারে না। এক সময় মাকে পেলেই সব অভাব দূর হ'য়ে যেত, সে আশ্রয়ও কবে ঘুচে গেছে, মল্লিকা বুঝতেই পারেনি।

মা কেবল-ই লিখছেন, কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে এসো, মল্লিকা, আমি বুড়ো হচ্ছি, আর দূরে দূরে থেকো না। যাবে নাকি সত্যি এখানকার কাজ ছেড়ে? মিমিদি কাছে এসে বলেন,—ও মল্লিকা, খুশি হ', ওঁর ছাপাখানায় শ্যামলীর দাদার চাকরী ক'রে দিলেন, এবার বোধ হয় ওদের দুঃখ ঘুচল। এতদিন লোকটা সিন্দুক ভাঙার শোকেই আধ-মরা হয়েছিল।

মল্লিকা বললে,—সিন্দুক ভাঙার শোকে না মিমিদি, আশা ভাঙার শোকে।

—তবে তাই হবে। যদ্দিন ওটা খোলা হয়নি, না খেয়ে না দেয়ে ভাবত ওটা খুললেই সব কষ্টের শেষ হবে। তাই মনে ক'রে বেঁচে ছিল।

রুমা আর সুকোমল এসে উপস্থিত হয়। বিয়ের তারিখ ঠিক হ'য়ে গেছে, সোমনাথবাবু আর মিমিদি না গেলেই নয়। মল্লিকা বললে,—মিমিদি কুড়ি বছর গঙ্গা পার হননি।

রুমা রেগে যায়।—কুড়ি বছর পার হননি বলেই তো এখন পার হবার সময় হয়েছে। পলাশ বলে শুধু বোকাদের মত বদলায় না। ও, মল্লিকা, তোমারো এখন আগ্রা যাওয়া হয় না। আর পনেরো দিন পরে বিয়ে, তুমি কি ব'লে এখন চলে যাবে?

—এক্ষুনি তো যাচ্ছি না, রুমা, পয়লা থেকে আমার ছুটি। তোমার বিয়ের দু'একদিন পরেই যাবো।

সুকোমল বললে,—ভালোই হলো। পলাশও ফিরে আসবে, সবাই থাকবে, বেশ হবে।

সবাই থাকবে, শুধু যে মানুষটি এ বিয়েটাকে সব চেয়ে বেশি উপভোগ করতো, গত বছরের ফুলগুলির মতো সে মিলিয়ে গেছে।

মল্লিকার সুকোমলের উপর একটু একটু রাগ হয়। রুমার উপরেও। পলাশের চাইতে কি ক'রে সুকোমলকে ভালো লাগতে পারে কারো? ভালো-লাগালাগির তল পাওয়া দায়। কেন ভালো লাগে, না লাগলেই তো ছিল ভালো।

সাতাশ

দেখতে দেখতে বিয়ের দিন এসে পড়ে। পনেরোটা দিন ঝড়ের মধ্যে কেটে যায়, সে কি কেনাকাটা, ফিটিং ফরমায়েসের ঘটা। সে কি জল্পনা-কল্পনা, ফর্দ করা, হিসেব কষা। মিমিদির গোটা বাড়িখানি ওলটপালট হ'য়ে যায়, পুরোনো বাক্স, তোলা সিন্দুক খুলে রাজ্যের রুপোর বাসন, কিংখাবের পর্দা, মখমলের গালচে বেরোয়।

রুমা বলে,—না, মা, আটচালা নয়, এখন বৃষ্টিবাদ্‌লা নেই, খোলা আকাশের নিচে করো। দোকানের ফুল লাগবে না, বাগানেই তো মেলা ফুল ফুটেছে।

মিনামাসিমার কি যেন মনে হয়, তাইতেই রাজী হন। কল্যাণ সমিতির সবিতা দিদিকে

সঙ্গে ক'রে মিনামাসিমা গাড়ি নিয়ে রাধাবাজার না কোথা থেকে রাশি রাশি চীনে লণ্ঠন কিনে আনেন। সকলে একবাক্যে বলে মিনামাসিমার আয়োজনে কোনো ত্রুটি কখনো থাকে না।

এমনি ক'রে রুমার সঙ্গে সুকোমলের বিয়ে হ'য়ে যায়। সুকোমলের মাস্টারমশাই-বাবা গলায় চাদর ঝুলিয়ে, বরকর্তা হ'য়ে আসেন। টিলিদের দলের যারা আজন্মকাল রুমাকে হিংসা ক'রে এসেছে, তারা মনে মনে খুশি হ'য়ে উঠল, রুমার সুখ দেখে নয়, বরকর্তার পাড়াগেঁয়ে রূপ দেখে। এমনকি তারপর কিছুদিন পর্যন্ত অনুরাধার নিজের স্বামীকে পর্যন্ত ভালো লাগলো। তারা ভাবলে, ঠিক হয়েছে, এ বংশের যেমনি অহঙ্কার তার উপযুক্ত পুরস্কার হয়েছে পাড়াগেঁয়ে মাস্টারমশাই-এর ছবি-আঁকিয়ে ছেলে। সুকোমলের অধরের কোমল রেখা, নয়নের উন্নত দৃষ্টি, ললাটে প্রতিভার অদৃশ্য জয়টিকা টপ্ ক'রে কারো চোখে পড়লো না। সে সব জিনিসের এ বাজারে বড় একটা চল নেই।

মিমিদি আর সোমনাথবাবুও আরো হাজারখানেক অতিথির সঙ্গে রুমার বিয়ের আয়োজনের প্রশংসা ক'রে বাড়ি ফিরলেন। মল্লিকা মিমিদির জন্য হাতির দাঁতের মতো রঙের দক্ষিণী শাড়ি কিনে দিয়েছিল, মিমিদিকে ম্যাগনোলিয়া ফুলের মতো দেখাচ্ছিল।

মল্লিকা বিয়ে-বাড়িতে থেকে গেল, মিমিদি বাড়ি ফিরে সোমনাথবাবুকে বললেন,—আচ্ছা, এর জন্য কেন মন কেমন করে, বলত?

সোমনাথবাবু হেসে বললেন,—মন খারাপ করার একটা কিছু না থাকলে যে লোকে সুখী হ'য়ে যাবে। তুমি জানো যে সুখী লোকরা সাহিত্যরচনা করতে পারে না?

মিমিদি বললেন,—কি যে বলো, আমি দারুণ অসুখী হ'লেও তো সাহিত্যরচনা করতে পারব না। রচনা করা দূরে থাকুক, বেশ ভালো একটা প্রেমের গল্প না হ'লে পড়তেই পারি না।

সোমনাথবাবু তাই শুনে বললেন,—কি জ্বালা! তোমার কথা কে বলেছে? তুমি অসুখী হ'লে আমিও অসুখী হই, আর আমি অসুখী হ'লে আমার ভালো সাহিত্যরচনা করা উচিত। এদিকে কাল মল্লিকা চল্‌ল আগ্রা, এখন আমার বই কি ক'রে এগোয়, একলা আমি থেই হারিয়ে ফেলি।

মিমিদি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—সেই তো মুশকিল, আর হয়তো দেবে না ওর মা এখানে থাকতে।

—ও কি কারো কথা শুনে চলে? মা-র কথায় হয়তো রাজীই হবে না। মিমিদি আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—খুব যে ও সুখী তা মনে হয় না। সেদিক দিয়ে মার কাছে গেলেই ভালো।

সোমনাথবাবু হঠাৎ ব'লে বসলেন,—তাইতেই বা ওর কি সুবিধে হবে? ঐ পলাশ গিয়ে হয়তো জুটবে সেখানে কিছুকাল বাদে।

—পলাশ? পলাশ তো ওর ছোটবেলাকার খেলার সাথী।

সোমনাথবাবু একটু হেসে প্রুফগুলিতে মন দিলেন।

লাখ কথার কমে বিয়ে হয় না; রুমার বিয়েতেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। লেডি চক্রবর্তী এলেন না, তাঁর গুরুদেবকে নাকি ভালো ক'রে বলা হয়নি। মিনামাসিমা লেডি

চক্রবর্তীর বাড়িতে গিয়ে গুরুদেবের জন্য চিঠি রেখে এসেছিলেন, গুরুদেব তখন কাঁচড়াপাড়ায়, সেখানে যাবার সময় ছিল না। এতে নাকি গুরুদেবের অমর্যাদা হয়েছে; লেডি চক্রবর্তী এতই ক্ষুণ্ণ হলেন যে তিনিও এলেন না। অথচ কেমন ক'রে খবর পেয়ে গুরুদেব শিষ্যের গাড়ি চেপে কাঁচড়াপাড়া থেকে এসে নিজের গলা থেকে সোনার হার খুলে রুমাকে আশীর্বাদ ক'রে গেলেন। পরে সে কথা শুনে পম্পা চক্রবর্তীর খেদের আর অন্ত রইল না।

তবে নিন্দুকেরা অত লোক একসঙ্গে বলার মধ্যে একটা লোক-দেখানো ভাবের ইঙ্গিত পেয়েছিল। যাদের সঙ্গে এঁরা আদৌ মেলামেশা করেন না, মেয়ের বিয়েতে তাদের ঘটা ক'রে নিমন্ত্রণ ক'রে সদর দরজায় নিজেরা দাঁড়িয়ে ফুলের মালা দিয়ে অভ্যর্থনা করার মধ্যে ভারি একটা যে অহঙ্কারী বড়মানুষী ভাব আছে, এ বিষয় তাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। টিলির প্রথম পক্ষের স্বামীকেও বন্ধুত্বের সূত্রে বলা হয়েছিল। সে দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীর কানে কানে বললে,—কি জানো, এই সব লোকরাই পাছে সরকারকে ট্যাক্স দিতে হয়, সেই ভয়ে জীবনকালেই জামাইকে অর্ধেক সম্পত্তি লিখে দেয়। এরা সব পারে। হাড়ে হাড়ে ডিজঅনেস্ট!

পরদিন সকালে, রুমার হীরের গয়নাগুলো লোহার সিন্দুকে তুলে রাখছে মল্লিকা, রুমা হঠাৎ বললে,—তোমার কি পলাশের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?

মল্লিকা বললে,—ঝগড়া হবে কেন রুমা? কাজের ভীড়ে কিছুদিন দেখা-শুনো হয়নি। এগুলোও সব একসঙ্গে তুলে দিই?

—দাও তুলে। এই ক' মাসে আমি তাকে যতটা বুঝেছি, তুমি এত বছরে তাও বোঝনি, সে তুমি যতই না নিজেকে বুদ্ধিমতী মনে করো।

মল্লিকার একটু রাগ হলো। যাদের নতুন বিয়ে হয়েছে, তারা মনে করে পৃথিবীর আর কোনো রহস্যই তাদের বুঝি জানতে বাকী নেই। মুখে শুধু বললে,—আমি মোটেই নিজেকে বুদ্ধিমতী মনে করি না। আমার মধ্যে একটা স্বাভাবিক বিনয় আছে।

—বিনয়ের অহঙ্কারের মতো সাংঘাতিক অহঙ্কার আর নেই, মল্লিকা। নিঃস্বার্থপররা যে রকম দারুণ স্বার্থপর হয় সে রকম আর কেউ হয় না।

মল্লিকা বললে,—তুমি থামো দিকিনি। আজকের দিনে এরকম কথা বলা কোনো ভালো স্ত্রীর উচিত নয়।

কিন্তু রুমাকে ছেড়ে আসবার সময় মল্লিকার কষ্ট হয়। সুকোমল, পলাশ, মিলি, টিলিরা আরো পাঁচজন সেখানে উপস্থিত ছিল। পলাশ বললে,—এ তোমার অন্যায়, মল্লিকা, রুমা যাবার আগে তুমি কেন যাবে?

মল্লিকা বললে,—আজ সন্ধ্যাবেলায় আগ্রা যাচ্ছি, পলাশ, খানিকটা গোছগাছ ক'রেও নিতে হবে, আবার সারাদিন বাইরে থাকলে মিমিদিরা ভারী ক্ষুণ্ণ হবেন।

মিনামাসিমা রুমার উপহার থেকে বেছে একখানি কাশ্মিরী শাড়ি এনে মল্লিকাকে দিয়ে, গালে চুমো খেয়ে বললেন,—মল্লিকা, তুমি নইলে আমাদের চলত না।

সেই সুযোগে রুমাও খানিকটা কেঁদে নিল, মল্লিকারও গাল বেয়ে জল পড়তে লাগল। শেষটা সুকোমলই বললে,—মল্লিকা, তুমি এবার যাবে কি না বলো? মিছিমিছি আমার বৌকে কাঁদাচ্ছ!

সুকোমলের দরদ দেখে সবাই খুব হাসল।

মিমিদি মা-মুরগীর মতো সারাদিন ডানা ঝাপটে বেড়ালেন।

—ও মল্লিকা, কিছু খাবার না নিলে কি ক'রে চলে? গাড়িতে কি পাবি না পাবি কে জানে?

কিছুতেই ছাড়েন না, মল্লিকা তাঁকে খুশি করবার জন্য রাজী হ'য়ে যায়।

কোথায় গেল শ্যামলী? এতকাল সে যা চাইছিল তাই বুঝি এবার ধরা দিল, তবে কেন চলে গেল শ্যামলী? কেন বিপাশা বিয়ে করে না শম্ভু সরকারকে? সেইখানেই তো প্রশ্নের উত্তর পেত। কি জানি চাওয়াকে বোধ হয় বেশি বাড়তে দিতে হয় না, তা'হলে আর পাওয়া তার নাগাল পায় না।

ছলছল কলকল ক'রে জোয়ারের জল মিমিদিদের বাড়ির সামনে দিয়ে বয়ে যায়। পথের বাঁকে বাবলা গাছের পাতা ঝরে জলের মধ্যে পড়ে। ঘাটের ধারে মাছের নৌকা বাঁধে, পাইকিরি ব্যবসা ওদের, খুচরো বেচবে না কিছুতেই; মিমিদিরা বাজার থেকে মাছ কিনে আনেন। বেলা গড়িয়ে যায়, বিকেল এসে পড়ে, মল্লিকা কি যে চায় মল্লিকা জানে না। গাড়ির সময় হ'য়ে যায়। গফুর এলুমিনিয়মের কৌটো ক'রে গরম লুচি তরকারী মল্লিকার জন্য গুছিয়ে দেয়।

সোমনাথবাবু আর মিমিদি মল্লিকাকে গাড়িতে তুলে দিতে যান। মল্লিকা মিমিদিকে জড়িয়ে ধরে বলে,—এত আদর আমার সইবে কেন, মিমিদি?

মিমিদির মুখে কথা যোগায় না, থেকে থেকে কপাল থেকে কোঁকড়া চুলের গোছা সরাতে থাকেন আর মল্লিকার মুখের দিকে চেয়ে ম্লান একটু হাসেন। সোমনাথবাবু একরাশ অনাবশ্যক পরামর্শ দেন। মল্লিকা বলে,—কিচ্ছু ভাবনা নেই, দরজা-জানলা এঁটে শোব, কিছুতেই খুলব না, দরকার হ'লেই লোকজন ডেকে একাকার করব, গিয়েই চিঠি দেব ইত্যাদি।

শেষকালে শেষ বিদায়ের কথা বলা হ'য়ে যায়, গাড়ি ছেড়ে দেয়, প্ল্যাটফর্মের উপরে দাঁড়িয়ে সোমনাথবাবু আর মিমিদি রুমাল নাড়তে থাকেন, তারপর তাও আর দেখা যায় না। মল্লিকা মার কাছে চলেছে।

এই তো সেই মল্লিকা। তিন বছরে একটা মানুষের কতখানি অদলবদল হয়। এই সেই পুরানো মল্লিকা, আগ্রায় যে ভাইবোনদের সঙ্গে মানুষ হয়েছিল, পলাশের খেলার সাথী সেই পুরানো মল্লিকা। মার আশা-ভরসা, মার বড় মেয়ে মল্লিকা, যার জীবনটা খোলা পাতার মতো ছিল, যে মুখে কাজের কথা বলত, চোখে স্বপ্ন দেখত, সেই পুরানো মল্লিকা। কিছু বদলায়নি, যেমন দেখতে ছিল তেমনি আছে। জামা কাপড়গুলো হয়তো আরেকটু ভালো, শরীরটা আরেকটু রোগা, সে কিছু নয়। শুধু মনের মধ্যেকার ছোট জিনিসগুলি বড় হ'য়ে গেছে, বড় জিনিসগুলি গুটিয়ে এসেছে। এই সেই মল্লিকা।—যেখানে গাড়ি থামবার কথা নয়, সেখানে হঠাৎ গাড়ি থেমে গেল। লাইন জোড়া আছে হয়তো। মল্লিকার ছোট কামরায় মল্লিকা একলা। এই সময় দুষ্টু লোকরা এইরকম ক'রে আঘাটায় গাড়ি থামিয়ে—। মল্লিকার কামরার দরজাটা বাইরে থেকে খুলে গেল, পলাশ এল। পলাশ এল।

পলাশ মল্লিকার হাত দু'খানি ধরে বললে,—তুমি আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করোনি, মল্লিকা।

দূরে বনের পিছনে আধখানা চাঁদ উঠেছে, গাছের মাথায় মাথায় তার আলো লেগেছে, লাইনের ধারের দীঘির জলে তার হাজার হাজার ছায়া পড়েছে।

॥ সমাপ্ত ॥

ইতিহাসে যৌনবৃত্তি

অতীন্দ্রনাথ বসু

একদা ফ্রয়েড মানুষের গোপনবৃত্তিটির আবরণ খুলে দিয়ে যে চমক লাগিয়েছিলেন তার ধাক্কা আজ অনেকটা কেটেছে। এখন স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে যা মানুষের চেতনা ও অবচেতনার অনেকখানি জুড়ে আছে আসংগলিপ্সা এবং একে বন্দী করতে গিয়ে সে সক্ষম ত' হয়ই নি, উপরন্তু বহু লঙ্কাকান্ড ঘটিয়েছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্প ও সাহিত্যসম্পদের উৎস যৌনবাসনা। কালিদাস, শেলী, ফাঁউয়াস, আনা পাভলোভা এই চিরন্তন কামনার রস মন্থন করে অমৃত পরিবেশন করেছেন, নারীর রূপ ও লীলার সন্ধানে আজও শিল্পীর মাধুকরী বৃত্তি সমান তৎপর। কিন্তু যৌনচেতনা শুধু কান্তরসের যোগান দেয় নি, দেশে দেশে অনেক দুর্যোগেরও সৃষ্টি করেছে। সে মোহিনী এসেছে একহাতে সুধাভান্ড, অন্যহাতে বিষপাত্র নিয়ে।

জীবজগতের দুই প্রধান বৃত্তি যৌনক্ষুধা ও অন্নক্ষুধা। মোটামুটি এই দুই ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে ইতর প্রাণীর যা কিছু সংগঠন ও সংগ্রাম। মানুষের আদিম জীবনেও এই দুই ক্ষুধা ছিল সর্বনিয়ন্তা। নারীকে উপলক্ষ্য করে যূথসমাজে ঝড় বয়ে যেত। এখনও কোন কোন উপজাতি কেহ তাদের নারীর শ্লীলতাহানি করলে সদলবলে তাকে শাস্তি দিতে যায়। কোথাও বা যুদ্ধ করে ভিন্ন জাতির কন্যাকে হরণ করে এনে বিবাহ করা ছিল বীরোচিত রীতি। বৈবাহিক অনুষ্ঠানের মধ্যে এখনও এর কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন কোচবিহারের সাঁওতালদের ভিতর। কোন কোন উপজাতির প্রচলিত প্রথা ছিল যে বরকে কন্যারত্ন লাভ করতে হবে জাতিশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখিয়ে—যেমন মধ্যযুগের ইয়োরোপে নাইটরা দ্বন্দ্বযুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ করে রূপসীদের কৃপাদৃষ্টি পেয়ে ধন্য হোত। কোন কোন ক্ষেত্রে মেয়েরা কেবল কৃপাদৃষ্টি দিয়ে অকিঞ্চনদের কৃতার্থ করে না। ভেডিস সাহেব পুডো-জাতির মেয়েদের সম্বন্ধে বলেছেন যে তারা সেনাবাহিনীর সংগে যুদ্ধক্ষেত্রে যায়, পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে তাদের কীর্তি পরিদর্শন করে, এবং তাদের উৎসাহিত করবার জন্যে কামোদ্দীপক গান গায় আর কোমরের ঘাগরা তুলে ধরে বরাঙ্গ উন্মুক্ত করে।

আবার আদিম উপজাতিই সর্বপ্রথম যৌনবৃত্তিকে নিয়মিত করে পরিবার গঠন করেছিল। সহবাস থেকে প্রেম, বংশরক্ষা, শ্রমবিভাগ ও জীবিকার্জন—এর তাগিদে পরিবারের উৎপত্তি হল। মানব সমাজ পশুসমাজ থেকে এইখানে হল ভিন্ন। পরিবারের সমষ্টিতে সমাজের নূতন রূপায়ন হল। কোথাও কোথাও সমাজ হল মাতৃপ্রধান। আদিম মানবের কাছে গূঢ়তম রহস্য ছিল জন্ম। এই রহস্যের অধিকারিণী নারী হল বন্দিতা। ঐশ্বরিক সৃজনী-শক্তি মাতৃত্বে প্রতিফলিত। তাই নারীর হাতে ন্যস্ত হল ধর্মজীবন। যূথমাতা হল প্রধান পুরোহিত। ক্যালিফর্নিয়ার শাস্তা এবং আসামের খাসিয়াদের মধ্যে এখনও এই মাতৃতন্ত্রের অবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু অধিক ক্ষেত্রে পুরুষ হল পরিবার ও সমাজের কর্ণধার। কারণ সে বাহুবলে বলীয়ান, জীবিকা সংস্থানে তার অংশ প্রধান। নারীর দৈবরূপ ও মাতৃরূপের পরিবর্তে প্রাধান্য পেল দাসী ও মোহিনীর রূপ। নারীকে বাহুবলের অভাব পূরণ করতে হল ছলাকলা দিয়ে। এর বাড়াবাড়ি হলে রহস্যময়ী ছলনাময়ী ডাইনী বলে

গণ্য ও দণ্ডিত হোত। যূথনেতারা পৌরুষের অধিকারে বহু পত্নী গ্রহণ করত, পত্নীদের পরিশ্রমের ওপর গড়ে উঠত জীবিকার সাচ্ছল্য ও পরিবারের সমৃদ্ধি।

পুরুষের প্রাধান্য সমাজে প্রতিফলিত হয়েছে পুরাকালীন দার্শনিক ভাবনায়। দেশ-নির্বিশেষে প্রাচীন শাস্ত্রকাররা নারীর অধমতার ও অধীনতার বিধান দিয়ে গেছেন। কনফুসিয়াস বলেছেন—নারীর ওপর পুরুষের অধিকার শক্তিমানের ওপর দুর্বলের অধিকার; পৃথিবীর ওপরে স্বর্গ, মন্ত্রীর ওপরে রাজা, শ্রেষ্ঠতার মাপ সর্বত্রই সমান। র‍্যারিস্টট্‌ল্ বলেছেন—পুরুষ স্বভাবত শ্রেষ্ঠ এবং সে নারীর ওপর শাসন চালাবে। মনুর বাক্য—নারী কখনো স্বাধীন হতে পারে না—সে বাল্যকালে পিতার, যৌবনে পতির ও বার্ধক্যে পুত্রের অধীন; অন্যথায় সে শ্রষ্টা হতে বাধ্য। মধ্যযুগে খৃষ্টান ধর্মনায়করাও এই মত পোষণ করতেন। আমাদের স্মার্তদের 'নরকস্য দ্বারম্'-এর মত তার্তুলিয়ানের বচন 'দি ডেভিল্‌স্ গেট্‌ওয়ে' সমান কুখ্যাত। একমাত্র প্লেটো ছিলেন এই মনোভাবের ব্যতিক্রম। তাঁর মত ছিল যে রাষ্ট্রের চোখে পুরুষ ও নারীর প্রকৃতিতে কোন তফাৎ নেই,—সুতরাং উভয়কে সমান নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব দেওয়া উচিত। সে যুগে এ মত ছিল অচল। গ্রীস ও রোমের প্রজাতন্ত্র নারীকে নাগরিক অধিকার দেয় নি।

রাষ্ট্রীয় অধিকার না পেলেও রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে নারীর ভূমিকা গৌণ ছিল না। পুরাণ ও পুরাবৃত্তে দেখা যায় যে যুদ্ধপ্রবণ জাতিদের সভ্যতা নারীকেন্দ্রিক। তাদের কথা ও গাথা রচিত হয় নারীর রূপ এবং আনুষঙ্গিক রেষারেষি ও রক্তারক্তি নিয়ে। বীরযুগের গ্রীসের চিত্র ফুটে উঠেছে হোমারের কাব্যে—হেলেনের রূপের আগুনে ট্রয় পুড়ে গেল, স্পার্টা ও ট্রয়ের বীরপুঙ্গবরা সেই কামনার যজ্ঞে আত্মাহুতি দিলেন। রামায়ণ ও মহাভারতের কেন্দ্রেও নারী। সীতাহরণের প্রায়শ্চিত্ত করেছিল লঙ্কা ও রাক্ষসকুল, দ্রৌপদীর অপমানের ফলে ধ্বংস হয়েছিল কুরুবংশ। এ সকল কথা ঐতিহাসিক না হোক, এ কাহিনী যুগমানসের প্রতিচ্ছবি। সে-কালের কামনা-কলহে রঞ্জিত হয়েছে হোমার, বাল্মিকী ও ব্যাসের মহাকাব্য।

ইতিহাসেও এ প্রকার রোম্যান্টিক সংঘর্ষের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। মিশরের রানী ক্লিওপেট্রার মোহজালে আবদ্ধ হয়ে সীজার ও য়্যান্টনীর পতন হল। কুড়ি বৎসর রোমের সমরনায়কদের ভাগ্য নিয়ে এই মায়াবিনী ছিনিমিনি খেললেন। বৎসরাজ উদয়ন উজ্জয়িনীর রাজকন্যা বাসবদত্তাকে হরণ করে বিবাহ করেছিলেন—দুই রাজ্যের বিবাদ তাতে প্রশমিত হয় নি। সংযুক্তাকে হরণ করে পৃথ্বীরাজ বীরকাব্যের রসদ যুগিয়েছিলেন বটে, কিন্তু রাজপুত জাতির মধ্যে মারাত্মক ফাটল ধরিয়ে মহম্মদ ঘোরির জয়যাত্রার পথ সুগম করেও দিয়েছিলেন। পদ্মিনীর রূপমুগ্ধ আলাউদ্দিনের আক্রমণে চিতোরে রক্তগঙ্গা বয়ে গেল। বিজয়নগরের সম্রাট প্রথম দেবরায় এক স্বর্ণকারকন্যাকে লাভ করবার জন্যে মুদ্‌গল আক্রমণ করলেন, বাহ্‌মনী সুলতান ফিরোজের হাতে তাঁকে পরাজয় স্বীকার করতে হল আর ঐ কন্যারত্ন লাভ করলেন ফিরোজের পুত্র হাসান খাঁ। চীনের সেনাপতি উ সাংকুই-এর রক্ষিতা চেন উয়ান উয়ানকে হরণ করেন পিকিং আক্রমণকারী লিংসুচেং। উ সাংকুই চেনকে পুনরুদ্ধার করবার জন্যে মাঞ্চু সৈন্য নিয়ে আসেন। এই উপলক্ষ্যে চীনে মাঞ্চুবংশের রাজত্ব কায়েম হল।

য়্যারিস্টট্‌ল্ বলেছিলেন যে যুদ্ধবৎসল জাতিদের যৌনবৃত্তি প্রবল হয়। রাজা ও রাষ্ট্রনায়কদের সমরপিপাসা জাগিয়ে তুলেছে ছলনাময়ী প্রেয়সীরা, জ্বালিয়ে তুলেছে যুদ্ধের আগুন। প্রণয়িনী য়্যাস্‌পাসিয়ার প্ররোচনায় পেরিক্লিস এথেন্সকে স্যামস ও স্পার্টার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়েছিলেন। শোনা যায় চতুর্দশ লুই অস্ট্রিয়া আক্রমণ করে যে সপ্তবার্ষিকী

যুদ্ধের অবতারণা করেছিলেন তার পিছনে ছিল তাঁর বিলাসসঙ্গিনী মাদাম দ্য পাঁপাদুরের মন্ত্রণা। কখনো কখনো মহারাজার ওপর রাজমহিষীর যৌনপ্রভাব সর্বনাশা অন্তর্বিবাদ ও আভ্যন্তরীণ উৎপাত ডেকে এনেছে। এর দৃষ্টান্ত জাস্টিনিয়ানের মহিষী থিয়োডোরা এবং জাহাঙ্গীরের বেগম নূরজাহান।

কন্যারত্ন অর্জন করবার জন্য বারোচিত শক্তিপরীক্ষার সংগ্রাম কোন কোন উপজাতির প্রথায় এবং কখনো কখনো সভ্যজাতির ইতিহাসেও দেখা যায়। নৃশংসভাবে পাশবিক ক্ষুধা মেটাবার জন্যে বিজাতির উপর আক্রমণের বহু দৃষ্টান্তও সভ্য মানুষের ইতিহাসে আছে। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে রোমানরা স্যাবাইনদের ওপর হামলা করে মেয়েদের ধর্ষণ করেছিল,—এই প্রসঙ্গ তুলে গ্রোটিয়াস এরূপ যুদ্ধের ন্যায্যতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বহু দেশে এটা সৈন্যদের অধিকার বলে গণ্য হোত যে অবরুদ্ধ দুর্গে ঢুকতে পারলে তারা যথেচ্ছ ভাবে পুরনারীদের সম্ভোগ করতে পারবে। রোম ও কার্থেজের সৈনিকরা গ্রীকদের নগরগুলি দখল করে এই বর্বর অধিকার প্রয়োগ করত। শতবার্ষিক যুদ্ধে ইংরাজরাও ছিল এ কাজের জন্য কুখ্যাত। ভারতবর্ষে রাজপুত মেয়েরা মুসলমান রাজা ও সৈনিকদের হাত থেকে সতীত্ব রক্ষা করবার জন্যে জহরব্রত পালন করত। দাঙ্গার সময়ে এখনও উভয় পক্ষের মধ্যে এই পশুপ্রবৃত্তি জেগে ওঠে এবং দাঙ্গার আগুনে ইন্ধন জোগায়। ষোল-সতের শতকের ফরাসী মন্ত্রী সালী যুগের নীতিবোধকে ঠিকই ব্যক্ত করেছেন—'নারীর ওপর বলাৎকার যুদ্ধকালের অবিসংবাদিত অধিকার।'

আদিম যূথসমাজে বিজিত উপজাতির বন্দী নরনারীরা হোত বিজেতার দাস। ভারতবর্ষেও এই প্রকারেই দাসপ্রথার উদ্ভব হয়। দাসীরা কেবল গৃহকর্ম করত না, তারা ছিল ভোগের উপচার। এই হতভাগিনীদের সূত্র ধরে সমাজে ক্রমশ বারবৃত্তি ছড়িয়ে পড়ল,—পুরনারী হল অবজ্ঞতা ও লাঞ্ছিতা। সমাজে সম্ভ্রান্তা নারীর অধোগমনের পথ তৈরী হল—সভ্যসমাজের চিত্তবিনোদনের দায় গ্রহণ করল বারবিলাসিনী। রূপযৌবনবতী বুদ্ধিমতী বিলাসিনীদের প্রভাব রাজদরবার পর্যন্ত বিস্তৃত হল। যে সব দেশ সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ছিল অগ্রসর তারা বিলাসিনীদের যৌন আবেদনকে শিক্ষা ও শিল্পসাধনা দিয়ে মার্জনা করে সভ্যরুচির উপযুক্ত করে নিয়েছিল। প্রাচীন ভারতের গণিকারা ছিল 'নগরশোভনা'—রাজা-মহারাজা, শ্রেষ্ঠী, কবি সকলেই যথাযোগ্য অর্ঘ্য নিয়ে তাদের দুয়ারে ধর্ণা দিত। চীনেও এই প্রথা গড়ে ওঠে এবং সেখানে গণিকারা আরও দীর্ঘকাল সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ভারতবর্ষের মত চীনেও এরা কবি, অধ্যাপক, রাষ্ট্রনেতা সকলের মনোরঞ্জন করত এবং তার জন্য প্রয়োজনমত রুচিবোধ, রসজ্ঞান ও কলাবিদ্যা সাধনা করত। কখনো কখনো এরা রাষ্ট্রনায়কদের রক্ষিতা হয়ে থাকত এবং এদের নিয়ে কর্তাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লাগত। এরা চীন ও ভারতে নৃত্য, গীত, কবিতা, চিত্র ইত্যাদি ললিতকলাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল—সাহিত্যের রসও জুগিয়েছিল—এরা বহু নাটক ও কাব্যের নায়িকা। জাপানের গীশা ও এথেন্সের হেটাইরাদেরও সমাজে কতকটা এই ধরনের প্রতিপত্তি ছিল। দার্শনিক ও রাষ্ট্র-নায়কদের মোহজালে আবদ্ধ করে এরা দেশের ভাগ্য নিয়ে অনেক খেলা খেলেছে। অনেক সময়ে গণিকা-হেটাইরাদের প্রমোদকুঞ্জে বসে রাজা ও রাষ্ট্রপতিরা গুরুতর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

উত্তরকালে অন্যান্য দেশেও এই প্রথা নানা আকারে দেখা দিয়েছে। জাতির অথবা শাসকগোষ্ঠীর অধঃপতনের সময়ে মোহিনীদের প্রভাব মারাত্মক হয়ে উঠেছে। উচ্ছৃঙ্খলগামী

সীজারদের ওপর মায়াজাল ছড়িয়ে মেসালিনা, য়্যাক্টি ও পম্পিয়ার মত দুষ্টা রমণীরা রোমের সর্বনাশ করেছিল। ফ্রান্সের চতুর্দশ ও পঞ্চদশ লুই এবং ইংলণ্ডের দ্বিতীয় চার্লস্-এর মত বিলাসী ও কামাসক্ত রাজারা বিলাসিনীদের প্রভাবে পড়ে দেশের শাসন ও কূটনীতিতে যে স্বৈরাচার এনেছিলেন তার মাশুল দুই রাজবংশ ও দেশবাসীকে সমান মাত্রায় দিতে হয়েছিল। মুঘল আমলে হারেমেও এমনই স্বেচ্ছাচারী রাজনীতির চক্রান্তজাল বোনা হোত আর দুর্বল বাদশাহ, তাঁর বংশধর ও রাজপুরুষরা সেই উর্ণজালে আবদ্ধ হয়ে পোকার মত মারা পড়তেন।

দেশকালনির্বিশেষে বহুপত্নীক রাজাদের বিভীষিকা ছিল অন্দরমহল। কূটবুদ্ধি কৌটিল্য রাজকে গুপ্তহত্যা থেকে বাঁচবার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন রানীদের মধ্যে গুপ্তচর লাগাতে। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের চীন দার্শনিক হান ফাইৎ সু এ বিষয়ে কৌটিল্যের মতই স্পষ্টভাষী। তাঁর বচন—"পঞ্চাশ বছরেও পুরুষের প্রেমে পড়বার বয়স থাকে; আর মেয়েদের রূপ তিরিশ বছর বয়সেই শুকিয়ে যায়। যে স্ত্রীর যৌবন ফুরিয়ে গেছে অথচ যার স্বামীর তখনো প্রেমে পড়বার বয়স যায় নি, সে নিশ্চয় সেই সময়ের কথা চিন্তা করবে যখন তার ওপর স্বামীর টান থাকবে না এবং তার পুত্রও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলে গণ্য হবে না। এ জন্যেই রানীরা সর্বদা তাদের স্বামীর মৃত্যুকামনা করে।"

বর্তমান যুগে মহিষীদের জায়গায় এসেছে বিলাস-সঙ্গিনী। সতের আঠার শতকে ইয়োরোপের কুলীনরা প্রাচীন ভারতীয় নাগরিকদের মত পত্নীর চেয়ে বিলাসিনীদের সঙ্গ ইয়োরোপের কুলীনরা প্রাচীন ভারতীয় নাগরিকদের মত পত্নীর চেয়ে বিলাসিনীদের সঙ্গ বেশী পছন্দ করত। ফ্রান্সে বুরবোঁদের আমলে যৌনবিলাসের কীট গোটা অভিজাত সমাজকে গ্রাস করেছিল। সেকালের সাহিত্যেও নারীবন্দনার উচ্ছ্বাস ও আতিশয্য মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। শিক্ষিতা ও মার্জিতরুচি উর্বশীদের ঘিরে ফ্রান্সের শিরোমণিরা আড্ডা জমাতেন—এগুলিকে বলত 'সালোঁ'। এখানে কেবল গল্পগুজব ও পানভোজন হোত না। এগুলি ছিল পদমর্যাদাশীল লোকদের মেরুদণ্ড শিথিল করবার জায়গা আর রাজনীতির ওপর নারীবুদ্ধি চালাবার আসর। ফরাসী বিপ্লবের ঝাপটায় ফ্রান্সের বনিয়াদী অভিজাত সম্প্রদায় যে রাতারাতি উৎখাত হয়ে গিয়েছিল তাতে এই মায়াবিনীদের বেশ কিছু অবদান আছে। মুঘল রাজত্বের শেষভাগে ওমরাহদেরও একই রকম চারিত্রিক দুর্দশা ঘটেছিল, সাম্রাজ্যের পতন যার অন্যতম পরিণাম।

আঠারো শতকের পর থেকে দেখা যায় যে ইতিহাসে যৌনপ্রভাবের মাত্রা কমে গিয়েছে। রুশ বিপ্লবের পূর্বাহ্নে জারের অন্তঃপুরে ও রাজপুরুষদের মধ্যে নারীর আবেদন বোধ হয় ইতিহাসের পাতায় শেষবারের মত স্বাক্ষর রেখে গেছে। বিশ শতকে ভঙ্গুর জারতন্ত্র ভিন্ন আর কোথাও যৌনপ্রভাব বড় একটা দেখা যায় না। লড়াইর সময়ে সৈনিকদের লালসার লাগাম আলগা করে দিতে হয়। অধিকৃত অঞ্চলের ওপর অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতার অধিকার না দিলেও তাদের ভোগের উপকরণ যোগাতে হয়। হুরিপরিদের দিয়ে চিত্তবিনোদন না করলে লড়াই-এ তাদের শৌর্য খোলে না। কিন্তু আজ এ জন্তুর গতিবিধি নির্ধারিত স্থানের মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ। ইতিহাসের ধারা আজ আর যৌনবৃত্তি দিয়ে পরিচালিত হয় না। কেমন করে এই পরিবর্তন সম্ভব হল তার সন্ধান করা দরকার।

নারী যখন পুরুষের মাতা ও সঙ্গিনীর আসন থেকে বিচ্যুত হল তখন থেকে সে মোহিনী মায়াবিনীরূপে ইতিহাসে আত্মপ্রকাশ করেছে। বহুপত্নীক রাজা অথবা নায়কের অন্দরমহলে সে বন্দী হল অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। অন্দরমহল হল যৌনচক্রান্তের আসর, রাজবংশের ও কূটনীতির আকাশে প্যালেস ইণ্ট্রিগের ধূমকেতু দেখা দিল। নারী মায়াজাল

পেতে পুরুষের নির্যাতনের প্রতিশোধ নিল।

উনিশ শতক থেকে নারীপ্রগতির যুগ শুরু হল। বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও যন্ত্রশিল্পের উন্নতির ফলে বাহুবলের দাম কমে গেল। সমাজ আর পুরুষশক্তির ওপর নির্ভরশীল রইল না। প্রমাণ হল যে শিক্ষা ও সুযোগ পেলে নারীও পুরুষের সমান অবদান রেখে যেতে পারে। নারী-অধিকারের আন্দোলন উঠল ইয়োরোপ জুড়ে—ইয়োরোপের হাওয়া এল এশিয়ায়। নারী স্বাধিকারবলে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়াল। পুরুষের এক বিবাহ ও নারীর রাষ্ট্রাধিকার গণতান্ত্রিক নিয়মে বিধিবদ্ধ হল। মায়াবিনীর রূপসজ্জা পরিত্যাগ করে সে নাগরিকের সাধারণ বেশে সমাজে স্থান করে নিল। ছলনার বলে রাষ্ট্রনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা তাই তাকে ছাড়তে হয়েছে।

ইতিহাসের ধারাগতি থেকে এই প্রবল জৈবিক শক্তির বিলুপ্তির এই হল কারণ। সামন্ত-প্রধান রাজতন্ত্রের অবসানের সঙ্গে সর্বত্র দলীয় শাসন দেখা দিয়েছে। একতান্ত্রিক অথবা গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে আজ দল রাষ্ট্রকে পরিচালনা করে। সেখানে পুরুষের কামনার এবং নারীর লাস্যলীলার অবসর নেই। সে গৃহে নারী, রাষ্ট্রে নাগরিক, সেখানে পুরুষের সঙ্গে তার ভেদ নেই। তাই রাষ্ট্রজীবনে আজ নারীর যে প্রভাব তা যৌনগন্ধমুক্ত।

আধুনিক সাহিত্য

১৮৫৭ সালের বেঙ্গল আর্মির বিদ্রোহাত্মক কার্যাবলী সুবিদিত, কিন্তু ঐ বিদ্রোহের মৌলিক প্রকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্টতর চিন্তার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। ইহার প্রকাশভঙ্গি ও পরিণতির পরিক্রমা এত বিভিন্ন অবস্থার পরিবেশে স্ফূর্ত হইয়া উঠিয়াছে যে বিষয়টি তর্কসাপেক্ষ হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। এই বাদানুবাদের মধ্য দিয়াই সেদিনের আলোড়নের গতি ও ধারার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইবে। সেনাবিভাগের নিয়মানুবর্তিতার দিক দিয়া ইহাকে 'সামরিক' আখ্যা দেওয়া হয়। যে ভাবে ধূমায়িত বহ্নির মতো বিদ্রোহ এক সৈন্যশিবির হইতে আর-এক সৈন্যশিবিরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। প্রায় পঁচাত্তর হাজার সশস্ত্র সৈনিকের যুদ্ধপ্রবণতা এই বিদ্রোহের ইন্ধন যোগাইয়াছিল সন্দেহ নাই। আবার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যাঁহারা এই বিদ্রোহকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে ভারতের স্বাধীনতা সমরের প্রথম সংগ্রাম বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। এ কথা অবশ্য খুবই সত্য যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেশব্যাপী এত বড় বিক্ষোভের আর নজির মেলে না। হায়দরাবাদ হইতে হিমালয়ের পাদদেশ অবধি তথাকথিত অসভ্য অশিক্ষিত আদিবাসী পাহাড়ী হইতে সুরু করিয়া শিক্ষিত সুসভ্য ভদ্রসম্প্রদায়, সামরিক ও বেসামরিক, রাজা ও প্রজা, হিন্দু ও মুসলমান—সর্বশ্রেণীর সর্ব-স্তরের লোক নানাভাবে নানা সময়ে বৃটিশ-বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া কিংবা সৈন্যসংগঠন ও সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া এক মহাবিদ্রোহের বনিয়াদ তৈয়ারী করিয়াছিল। দেশকে স্বাধীন করিবার মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া অনেকে যে নিঃশেষে প্রাণদান করিয়াছিল, তাহারও প্রমাণ আছে। অনেক বিশেষজ্ঞ ১৮৫৭ সালের আন্দোলনে দেশের সামন্ত প্রভুদের হাত ছিল বলিয়া মনে করেন। সে সময়কার বিদ্রোহ যে অনেকটা ফিউডাল ভাবাপন্ন হইবে, ইহা স্বাভাবিক। ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনার ফলে ফিউডাল সমাজে ভাঙন ধরিয়াছিল, ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল সামন্ত প্রভুদের পূর্বতন পদমর্যাদা ও ভূমি-আধিপত্য। তাই সেই সব ক্ষুব্ধ সামন্ত প্রভুদের অনেকে সিপাহী বিদ্রোহের সুযোগ গ্রহণ করিয়া পূর্ণোদ্যমে স্বীয় সৈন্য-সামন্ত লইয়া ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহার ফলে সিপাহী বিদ্রোহে ফিউডাল আন্দোলনের ঐকিক রূপটি সুন্দরভাবে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। অন্যপক্ষে, এই বিদ্রোহে জনসাধারণের মানসিক অবস্থা, ধ্যান-ধারণা ও তাহাদের ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রাম সমর্থনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণভাবে ব্রিটিশ-বিরোধী না হইলেও, ১৮৫৭ সালের আবহাওয়ায় জাতিধর্ম বিনাশের আশঙ্কায় ও শোষণনীতির তাড়নায় তাহারা সন্ত্রস্ত ছিল। বিদ্রোহের অগ্ন্যুৎসার ও ইংরাজ সরকারের চণ্ডনীতির চাপে তাহাদের এই ত্রাস গভীর ও তীব্র ইংরাজবিদ্বেষে পরিণতি লাভ করে। এইভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ কেন্দ্রায়িত হয় এবং ইহা হইতে বিদ্রোহ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। যুদ্ধে যাহারা অংশগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য ছিল। সিপাহীরা জাতি রক্ষার্থে, ভূমধ্যকারীরা বিষয়সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের বাসনায়, জনসাধারণ ধর্মের গ্লানি ও নানাবিধ অভাব-অভিযোগ দূর করিবার জন্য এবং মুসলমান সম্প্রদায় তাহাদের হৃতগৌরব পুনঃ-

প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। একই সময়ে একই শক্তির বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্তরের লোকের সমরপ্রচেষ্টা ঘটনাস্রোতের সাময়িক রূপ উদ্‌ঘাটনের সহায়ক। সামরিক সংঘর্ষ হইতে যে বিদ্রোহের সৃষ্টি তাহা পরে গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল। গুজর, মেওয়াটি, রঙ্গর, ভোগ্‌তা, কোল, মুণ্ডা, প্রভৃতি নানা আঞ্চলিক জাতি ও উপজাতিসমূহ বিদ্রোহীদের সঙ্গে নিছক সাধু উদ্দেশ্য লইয়া যে হাত মিলাইয়াছিল, তাহা নহে, তবু তাহাদের দুর্দমতায় ইংরাজ শাসনের কাঠামো যে শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল—বিদ্রোহের এই আংশিক সাফল্য সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই।

সিপাহী বিদ্রোহের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গি ও বিস্তৃততর পরিধি বিদ্রোহের সুনিহিত রূপটিকে এমনভাবে ঢাকা দিয়াছে যে ঐতিহাসিক ও পাঠক উভয়েই উহা উদ্ধার করিতে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছেন। শুধু তাই নয়, বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যেও স্বার্থের সংঘাত, সংগঠন-শক্তির অভাব, আত্মকলহ তাহাদের কাপুরুষতা, বর্বরতা, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং তদুপরি হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসকে ম্লান করিয়াছে। সমগ্র পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে দুস্তর পার্থক্য থাকায় বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোও অপরিহার্য। এতদ্‌সত্ত্বেও মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে ১৮৭৫ সালের বিদ্রোহ শুধু সিপাহী-নির্ভর ছিল না, তাহার পিছনে ছিল দেশব্যাপী জনসাধারণের সমর্থন। অনুকূল অবস্থার যোগাযোগে এই দুইটি আন্দোলনই অধিকাংশ জড়িত ছিল। সামরিক বিদ্রোহের প্রবাহে জনবিদ্রোহ গড়িয়া উঠে। সিপাহীদের উদ্দামতার জন্য জনবিক্ষোভের স্বরূপ প্রথম দৃষ্টিতে চোখে পড়ে না। কিন্তু ইহা নিতান্তই আকস্মিক ছিল না। দীর্ঘদিনব্যাপী এই অন্তর্বিরোধের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। 'বিদ্রোহ'পূর্ব যুগেই ব্রিটিশবিরোধী প্রজাবিক্ষোভ, সামন্তবিক্ষোভ প্রভৃতি বিবিধ বিদ্রোহের বিস্ফোরণ দেখা যায়। এই বিক্ষোভ-গুলির পিছনে ছিল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অসন্তোষ, অর্থাৎ ব্রিটিশ রাজত্বের তদানীন্তন বাস্তব অবস্থাই তাহাদের উৎস। ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহে ঐ বিক্ষোভগুলির একটি পূর্ণায়তন রূপ দেখা যায় এবং ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে তাহাদের চরম পরিণতি ঘটে।

এই দুই যুগের জনবিক্ষোভের যোগসূত্র মূলত এক, কারণ তখনকার দিনে আন্দোলনগুলির বিদেশী ঔপনিবেশিক নীতিবিরোধী এবং সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র সে যুগের সামাজিক অবস্থার-ই স্বতঃসিদ্ধ ফলশ্রুতি। ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম পর্বে সামন্ত-প্রভুরাই তাহাদের সম্মান, পদমর্যাদা ও বিষয়সম্পত্তি রক্ষার জন্য লড়াই করিল, আর ১৮৫৭-র বিদ্রোহে তাহারা পুঞ্জীভূত অসন্তোষের বেদনায় সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বিদেশী রাজত্বের প্রথম শতাব্দীতে দেশের ভূস্বামীরাই নবাগত শাসকসম্প্রদায়ের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছে। চিরস্থায়ী এলাকার অবস্থা একটু বিভিন্ন ধরনের। সেখানে নিম্নস্তরের কৃষিজীবীরা সামন্ত-প্রভু ও তাহাদের রক্ষক ইংরাজদের বিরুদ্ধে খণ্ড খণ্ড ভাবে অনেক আন্দোলন করিয়াছে। কৃষিদের এই বিক্ষোভ ঐ অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী হইয়াই রহিয়া গেল। এদিকে উত্তর প্রদেশ (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ) এবং অযোধ্যায় তালুকদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া যে গ্রামণীয় (Village System) ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় তাহাতে জমি-নির্ভর নিম্ন পর্যায়ের ভূমাধিকারীর অনেক সুবিধা হইল বটে কিন্তু তাহাদের অভ্যুত্থানের পথ বিশেষ সুগম হইল না। সমাজের প্রধান শ্রেণী জমির মালিক, তালুকদারের উচ্ছেদের ফলে সমাজজীবনের সংহতি ও ভারসাম্য নষ্ট হইল। ইহাতে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে মিউটিনি সমরের ভয়, ত্রাস

ও অসন্তোষ সংক্রামক হইয়া দাঁড়ায়। নিম্নস্তরের ভূমাধিকারীরাও নিজেদের পদোন্নতিতে সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট ছিল না। তাহারা খাজনা, কর, অতিরিক্ত মাশুল ইত্যাদি নানাবিধ সরকারী দাবির চাপে জর্জরিত হইয়া পড়ে এবং উপরন্তু সেই সময়কার জাতি-ধর্ম সংক্রান্ত আতঙ্কে বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। শেষ পর্যায়ে এই ব্যবস্থার ফলাফলে কোনো তারতম্য দেখা গেল না। সমাজের উপরতলার লোককে উচ্ছেদ করিয়া ভূমিহীন কৃষককে স্থিতিশীল করিয়া, ব্রিটিশ সরকার যে রক্ষাকবচের সৃষ্টি করিয়াছিল, কার্যকালে তাহার কোনো সুফলই তাহারা পাইল না। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রচণ্ড ঢেউ-এ সর্বপ্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধান ভাসিয়া গেল। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত সমস্ত স্তরের লোকই সামন্ত প্রভুদের ছত্রছায়ায় নিজেদের স্থান বাছিয়া লইয়া যথারীতি সংগ্রামে অবতীর্ণ হইল। ইহা অবশ্য সহজেই প্রতীয়মান হয় যে বিদ্রোহগুলি মূলত সামন্তনির্ভর ছিল, কিন্তু শুধু ভূমাধিকারীদের স্বার্থবোধই যে এই সকল বিদ্রোহের জন্মদাতা, এমন কথাও বলা চলে না। সামন্তবিদ্রোহ ও প্রজাবিদ্রোহের মধ্যে সাধারণভাবে যে পার্থক্য দেখা যায়, এ-দেশে বিদেশী শাসনের পটভূমিকায় তাহা প্রকাশ পায় নাই। ব্রিটিশ শাসন সামন্ত, প্রজা সকলের কাছেই দুর্বিষহ মনে হইত এবং ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদই ছিল তাহাদের কাম্য। ফলত এই মনোভাব শ্রেণীস্বার্থকে প্রকট করিয়া তুলে নাই। দেশের রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার আলোড়ন ও ভবিষ্যতের উন্নতির দিকেও সামন্তদের লক্ষ্য ছিল মনে করা অযৌক্তিক নয়। তাহারাই ছিল প্রকৃত-পক্ষে দেশের নেতা, তাহাদের নেতৃত্বেই জনবিক্ষোভ সমাজব্যাপী প্রতিরোধের আকার ধারণ করে। যুদ্ধকালে বিদ্রোহী সৈন্যরা যুদ্ধকৌশল, সৈন্যসংখ্যান এমন কি এনফিল্ড রাইফেল ব্যবহারেও পশ্চিমী রণব্যবস্থার অনুকরণের পরিচয় দিয়াছিল, এবং রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বহুল পরিমাণে বিধ্বস্ত করিলেও; সংগ্রাম সফল হইলে এই সব পাশ্চাত্য পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইত। নানা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ফিউডাল কাঠামোর পরিবর্তন এবং জননির্ভর শাসনব্যবস্থার প্রচলন অবশ্যম্ভাবী না হইলেও কল্পনা করিতে কষ্ট হয় না। কাজেই সিপাহীবিদ্রোহকালীন জনবিক্ষোভগুলি শুধু প্রতিক্রিয়াশীল ছিল, এমন কথা জোর দিয়া বলা চলে না।

বিদ্রোহের গতি সব সময়েই সীমায়িত থাকে না। বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্ ডিজরেলী ভারতীয় বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে একদা মন্তব্য করেন যে সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন চর্বিমেশানো কার্তুজের উপর নির্ভর করে না। এখানে এই ইঙ্গিতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে দেশব্যাপী বিদ্রোহের মহাসংকটে ব্রিটিশ রাজশক্তি যে ভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে তাহাতে তাহাদের শাসনের আভ্যন্তরীণ বাস্তব অবস্থার ভূমিকা নিশ্চয়ই তুচ্ছ ছিল না। শুধু বিদ্রোহী সিপাহীদের লড়াই-এর ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে না। সিপাহী বিদ্রোহের প্রধানতম ঐতিহাসিকে দেখিয়াছেন যে সেদিনের ভয়-ভাবনা ও বিক্ষোভের পিছনে চর্বি-মাখানো কার্তুজের প্রশ্ন খুবই নগণ্য ছিল। বিদ্রোহের প্রথম পর্বে সিপাহীদের উন্মত্ততাই নজরে পড়ে, কিন্তু স্থানে স্থানে সিপাহীদের আক্রমণের পূর্বেই যে জনসাধারণের বৃহৎ অংশ প্রবল আন্দোলন করিয়াছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়। তারপর জুন ও জুলাই মাসে সমগ্র দেশে যে ধ্বংসের লীলা চলিয়াছিল, তাহা জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন ভিন্ন সম্ভব ছিল না; এবং দীর্ঘকাল যাবৎ সংগ্রাম চালানো সুসাধ্য হইয়াছিল এই কারণেই। নিছক সিপাহীদের হাঙ্গামা হইলে বিদ্রোহবহ্নি অনেক আগেই নির্বাপিত হইত। এইসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে অনেকেই বিশেষ গুরুত্ব

প্রদান করেন। উদাহরণত, বিখ্যাত ঐতিহাসিক মলেসন বলিয়াছেন যে সেদিনের অভ্যুত্থান সর্বতোভাবে সামরিক ভাবাপন্ন ছিল না। এ প্রসঙ্গে টি রাইস হোমসের কথা মনে পড়ে। সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁহার রচিত ইতিহাস কেহ কেহ উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন। ঐ বিদ্রোহের অনুগামী জনসাধারণের অন্তর্যুদ্ধের কথা লেখাও হোমসের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তাহা করেন নাই। তাঁহার বৃহদাকার পুস্তকটিতে ঐ সম্বন্ধে কোথাও কোনো ব্যাপক আলোচনা নাই। তবু এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে সিপাহী-বিদ্রোহের ঐতিহাসিকদের মধ্যে তিনি-ই প্রথম 'সিভিল রিবেলিয়ান' কথাটি ব্যবহার করেন এবং 'সিভিল রিবেলিয়ান' সম্পর্কে যে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা বর্তমান, তাহার ইঙ্গিত দেন। এই দিক হইতে দেখিলে সিপাহীবিদ্রোহের মর্মকথা উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সম্পর্কে পণ্ডিতবর্গের জ্ঞান-গবেষণা এখনো পর্যন্ত ঐ খাতে প্রবাহিত হইল না। বিদ্রোহের প্রথম শতবার্ষিকী উপলক্ষে যে সকল বরেণ্য ঐতিহাসিক এ সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও গ্রন্থে 'সিভিল রিবেলিয়ন'-এর লৌকিক স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের কোনোরূপ প্রয়াস দেখা গেল না। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁহার কীর্তিস্তম্ভসদৃশ পুস্তকটিতে বিদ্রোহী নেতাদের সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সন্নিবেশিত করিয়াছেন। অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে তিনি বিদ্রোহী নেতাদের যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা একমাত্র সত্যান্বেষী, বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের পক্ষেই সম্ভবপর। নিরপেক্ষ বিচারকের মতো তিনি নেতাদের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে ঐ সকল নেতাদের অসীম শৌর্যবীর্যের জন্য প্রাপ্য শ্রদ্ধার্ঘ্য দিতেও কোনোরূপ কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। রাজ্যের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ঝাঁসীর রানীর ভয়-ভাবনা, ইংরেজ আশ্রয় গ্রহণে তাহার ইচ্ছা এবং পরে ইংরেজবিরোধী সুদৃঢ় মনোভাব ও অসমসাহসিকতা ইত্যাদির যথাযোগ্য পরিচয় দিয়া রানীর যে চরিত্রচিত্র তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই তাঁহার মৌলিক সৃষ্টি বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার ন্যায় ঐতিহাসিকও বিদ্রোহের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করিতে যাইয়া অন্য ধারণায় অভিভূত হইয়া পড়েন। স্বার্থসন্ধানী নেতাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে তিনি বিদ্রোহকে দেখিলেন। এই ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণে যাহাদের তিনি দেখিতে পাইলেন তাহাদের সম্মানজনক আসনে বসাইবার মতো কোনো তথ্য বা যুক্তিসংগত কারণ তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি দেখিলেন যে বিদ্রোহের মূলে কোনো দেশব্যাপী ষড়যন্ত্রের আভাসও পাওয়া যায় না। সাধারণত একটি জাতির মুক্তিসংগ্রামে যেমন নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি ও সংগঠন থাকা প্রয়োজন, সিপাহীবিদ্রোহে তাহার কোনো প্রমাণ মেলে না। স্বীয় পদ্ধতির গবেষণাপ্রসূত জ্ঞানের আলোতে তিনি ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানকে জনবিদ্রোহ বলিবার কোনো যুক্তিসংগত কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না। তাঁহার মতে অল্পবিস্তর জনসমর্থন থাকিলেও এই বিদ্রোহকে জাতীয়তাবোধের উন্মেষক কোনো সংগ্রাম মনে করা নিতান্তই অন্যায়। ডক্টর মজুমদার এ-কথাও বলেন যে ১৮৫৭-র আন্দোলনের আঞ্চলিক বিস্তারও খুব সীমাবদ্ধ ছিল এবং সামাজিক বিশ্লেষণ ইহাকে ফিউডাল প্রতিক্রিয়া বলিলেও ভুল হইবে না।

এখানে প্রশ্ন উঠে, নেতাদের মনোভাব ও আচরণ হইতে বিদ্রোহের প্রকৃতি নির্ণয়

করা চলে কিনা। নায়কসর্বস্ব ইতিহাসের বিপদ এই যে ইহা অংশবিশেষের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে এবং সামগ্রিক রূপটিকে বিকৃত করে। জাতীয় বিদ্রোহ যে নায়ক ভিন্ন হইতে পারে না কিংবা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হইতে হইবে, এমন কোনো নজির ইতিহাসে নাই। সুগঠিত নেতৃমণ্ডলী ভিন্নও সংখ্যাধিক জনসাধারণ সেদিনকার আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল। প্রত্যেক জিলার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা এ সম্বন্ধে যে সব রিপোর্ট পাঠাইয়াছিল, 'ন্যারেটিভ অফ ইভেন্টস' নামক বিরাট গ্রন্থে সংকলিত ঐ সকল রিপোর্টের সম্ব্যবহার করিলে উপরি-উক্ত মতামতের সত্যতা নির্ণয় করা যাইতে পারে। এ-পর্যন্ত কোনো ঐতিহাসিক ঐ গ্রন্থগুলি হইতে ১৮৫৭ সালের জনবিদ্রোহের ধারাবাহিক কাহিনী উদ্ধার করেন নাই।

সিপাহীবিদ্রোহের নিজস্ব একটা সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। শুধুমাত্র সরকারী দপ্তরের অপ্রকাশিত দলিলপত্র দিয়া বিদ্রোহের ইতিহাস রচনা করা যায় না। আর এমন কোনো কাগজপত্র বাহির হইবার সম্ভাবনাও বিশেষ নাই যাহাতে বিদ্রোহের স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা করিতে হইবে। বাহাদুর শাহ ও ঝাঁসীর রানী সম্পর্কে যে সন্দেহ অদ্যনা জাগিয়াছে, ডড্‌ ও কিনকেড তাহাদের গ্রন্থে তাহা লিখিয়া গিয়াছিলেন। তথ্যের অভাব নয়, শুধু দেখিবার ধরনেই মতবাদের সৃষ্টি হয়। ডক্টর মজুমদারের অভিমত শুধু একটা বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। বিদ্রোহকে ফিউডাল প্রতিক্রিয়া বলিয়া বর্ণনা একটা যান্ত্রিক ব্যাখ্যার মতো শুনায়। মনে রাখিতে হইবে ইউরোপের ফিউডাল সংগ্রামের পিছনে কোনো বৈদেশিক রাজত্বের অস্তিত্ব ছিল না। ব্রিটিশ রাজত্বের বিলোপ ঘটানো যদি সিপাহী বিদ্রোহের সাধারণ লক্ষ্য হইয়া থাকে তাহা হইলে ১৮৫৭ সালের সামন্তপ্রভুদেরই ইহার উদ্যোক্তা বলিতে হয়। ফিউডাল সমাজের নায়করা প্রগতির প্রবক্তা হইতে পারে না, এই ধারণা ইতিহাসে অচল। তবু সেদিনের মহাবিদ্রোহ সামরিক যুদ্ধ না জনগণের বিদ্রোহ ও জাতীয়সংগ্রামের উন্মেষক, এই প্রশ্ন ঐকান্তিক ব্যাপকভাবে আলোচনা করিয়া ডক্টর মজুমদার সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের গ্রন্থটি 'মিউটিনি'-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ও উল্লেখ্য অবদান। বিষয়বস্তু বর্ণনার দক্ষতায় ও রচনাশৈলীতে ইহা অতীব সুখপাঠ্য হইয়াছে। ফরেস্ট ও ম্যালেসনের মতো তিনি রাজনৈতিক ও পারি-পার্শ্বিক অবস্থা ও উভয়দলের সজ্জিত অস্ত্রশক্তি ও সামরিক সংঘাতের অতি প্রামাণিক ও বিস্তৃত বিবরণ দিয়া সিপাহী বিদ্রোহের ও যুদ্ধের একটি উচ্চাঙ্গ ও মনোরম ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন। তথ্যসম্পদে ও তথ্যবিশ্লেষণেও গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য প্রশংসনীয়। বিদ্রোহের সামরিক নেতাদের শেষ পর্বের কার্যকলাপ নূতন উপাদানের সাহায্যে অনুসন্ধান করা হইয়াছে। ফিরোজ শাহের পরবর্তী কাহিনী ও মহম্মদ হাসান সম্পর্কে অপ্রকাশিত কাগজপত্র হইতে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে সকলেই বিশেষ আকৃষ্ট হইবে।

কিন্তু তথ্যনির্বাচনে ঐতিহাসিক সনাতনী পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। নিকলসন্‌, হডসন্‌, স্যার কলিন, হ্যাভেলক ও উট্‌রাম প্রভৃতি রণনায়কদের যে সমুজ্জ্বল বর্ণনা দিয়াছেন তার পাশে বিপক্ষ দলের নেতাদের পরিচয় ও কার্যাবলীর চিত্র তেমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠে নাই। ইহা অবশ্য অনস্বীকার্য যে বখ্‌ত খাঁ, রাও সাহেব, মেহেন্দী হাসান, বান্দা হোসেইন, প্রভৃতি নেতারা সমপর্যায়ে পড়েন না। কিন্তু লক্ষ্ণৌতে যুদ্ধের শেষের দিন ২১শে মার্চ স্যার এডওয়ার্ড লুগার্ডের সহিত ফৈজাবাদের মৌলভীর যে যুদ্ধ হইয়াছিল,

তাহা গ্রন্থে বাদ পড়িয়াছে। পূর্বসূরী ফরেস্ট এই ভীষণ সংগ্রামের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছিলেন। বিদ্রোহী সেনাবাহিনী বেসামরিক নেতাদের নেতৃত্বে আরও অনেক রণক্ষেত্রে দুর্জয়বেগে ব্রিটিশদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিল। চান্দা, সুলতানপুর, আমোহা, নবাবগঞ্জ, মন্দোরী, আজমগড় প্রভৃতি জায়গায় যে তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইসব ঘটনা নির্দেশের অভাবও লক্ষণীয়। বিদ্রোহের সময় ইংরেজদের পরিস্থিতি সম্পর্কে যে-সব ঐতিহাসিক করুণকাহিনী প্রচলিত আছে, সুবিদিত সেই সব কাহিনী-উল্লিখিত ঘটনাগুলির বহু পৃষ্ঠাব্যাপী উল্লেখ আছে। হ্যাভেলক ও নীলের মনোমালিন্য, উটরামের হ্যাভেলক-প্রীতি, মিসেস বার্টরুমের স্বামীবিয়োগ, অঙ্গদের দৌত্য, ক্যাভানার চমকপ্রদ গোয়েন্দা-গিরি, লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সিতে অবরুদ্ধ ইংরেজদের অনশন ও অভাব, আগ্রা ফোর্টে ইউরোপীয়ানদের জীবনযাত্রা, বাদশাহী প্রাসাদের নিভৃতকক্ষে ভূতবিভীষিকা এবং সর্বোপরি ব্রিটিশ পলাতকদের প্রাণরক্ষার কাহিনী সম্বলিত হওয়াতে সিপাহী বিদ্রোহের এই ইতিহাস জনপ্রিয় হইবে সন্দেহ নাই।

মূলত, গ্রন্থখানি ইংরেজমুখী, তাই ঐতিহাসিক বিচার করিলেন : ১৮৫৭ সালের যুদ্ধের কোনো নৈতিক প্রশ্ন ছিল না। সেই সময়কার ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারতীয় বিদ্রোহ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এমন ধরনের কথা বলা হইত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ণধার ভেরন্ স্মিথ ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদের প্রতীক। দেখিতেছি তাঁহারই কথার প্রতিধ্বনি এখনও মিলায় নাই। আজ একশত বৎসর পরে মিউটিনি সম্পর্কে জ্ঞান-গবেষণা বিস্তারের পরও ঐ সব সমসাময়িক মতবাদের প্রচলন দেখা যায়। ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে দিকে দিকে জনগণের বিদ্রোহ ও অগণিত লোকের জীবনবিসর্জন—এ সবের পিছনে কোনো নৈতিক আদর্শ না থাকাটা আশ্চর্যকর উক্তি। গ্রন্থের শেষের দিকে বিদ্রোহে জন-সমর্থনের কথা ও অযোধ্যা ও শাহবাদ অঞ্চলে সংগ্রামের জাতীয় মর্যাদার যে অল্পবিস্তর আলোচনা আছে তাহা নিতান্তই প্রক্ষিপ্ত মনে হয়; পুস্তকের মূল সুরের সঙ্গে তাহার কোনো সংগতি নাই এবং তাহা যুক্তিনির্ভরও নয়।

ইহা অতি দুঃখের কথা যে সিপাহী বিদ্রোহে দৃষ্টিপাতের পুরাতন ধরনটি এখনও স্বীকৃত হইতেছে। যাহারা নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া এই বিদ্রোহের অপক্ষপাত বিচারের গুরুদায়িত্ব লইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে এই মহা-বিদ্রোহের উৎস ও উৎপত্তি সম্বন্ধে সম্যক বিশ্লেষণ অপরিহার্য। ঐ প্রসঙ্গে প্রাক-মিউটিনি যুগের খণ্ড খণ্ড জনবিক্ষোভ ও জনবিদ্রোহের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে, ১৮৫৭ সালের আন্দোলনকে সামরিক প্রতিপন্ন করাই যে ঐতিহাসিকের উদ্দেশ্য তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে যোগসূত্রের অন্বেষণই ঐতিহাসিকের কর্তব্য। ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম শতকে বিদেশী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে সব বেসামরিক আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল সেই পটভূমিকায় মহাবিদ্রোহের কার্যকারণ নির্ণয় করা অযৌক্তিক হইত না। এ সম্বন্ধে সুবিদিত প্রামাণিক তথ্যগুলির সদ্ব্যবহার প্রয়োজন ছিল। মীরাটের সিপাহীদের হাঙ্গামা যদি দমন করা যাইত তাহা হইলে ১৮৫৭ সালে কোনো ব্যাপক বিদ্রোহ হইত না, এমন সিদ্ধান্ত করিলে বুঝিতে হইবে যে ঐতিহাসিক শুধু সামরিক পরিস্থিতির উপরই জোর দিতেছেন। দেশজোড়া যে বিদ্রোহের মনোভাব প্রকাশ পাইতেছিল তাহা নাকচ করিবার তথ্য কোথায়? অল্প কয়েক মাসের মধ্যে বহরমপুর, ব্যারাকপুর ও লক্ষ্ণৌর ঘটনাস্রোত পূর্বপ্রস্তুতির জ্ঞাপক নয় কি?

সিপাহী বিদ্রোহের অনেক কথাই ঐতিহাসিক সযত্নে এড়াইয়া গিয়াছেন। সিপাহীরা

তাহাদের অভাব অভিযোগ দূর করিবার জন্য সামরিক জীবনের শৃঙ্খলা ভাঙিয়াছিল সত্য কিন্তু ধর্মের গ্লানি দূর করিতে গিয়া দেশব্যাপী লোকের যে সহানুভূতি ও সমর্থন পাইয়াছিল তাহার পরিপূর্ণ আলোচনা সকলেই আশা করিবে। এই আলোচনার আদি প্রশ্ন ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ জনগণের অভ্যুত্থান কিনা এ সম্বন্ধে প্রকাশিত মালমশলার সম্যক ব্যবহার করা হয় নাই। ঐ বিদ্রোহ ফিউডাল প্রতিক্রিয়া কিনা তাহাও ব্যাপক অনুসন্ধানে আরও পরিষ্কার হইতে পারিত। এ সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে অযোধ্যার বা উত্তর প্রদেশের তালুকদাররা কি পর্যন্ত যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহার কোনো বিস্তৃত আলোচনা ঐ গ্রন্থে নাই। জেনারেল ইনস দেখাইয়াছিলেন যে ক্যানিং-এর ঘোষণাকাল পর্যন্ত তালুকদাররা সরাসরি যুদ্ধে যোগদান করে নাই। তাঁহার এই থিওরি বিখ্যাত ঐতিহাসিক হোম্‌স্ আরও জোর করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। এ ভ্রান্ত মতবাদ এখনও টিঁকিয়া আছে। দুঃখের বিষয়, ডক্টর সেনও এবংবিধ মতবাদের সত্যতা নিরূপণ করিলেন না। সমসাময়িক বেসামরিক কর্মচারী মার্টিন গাবিন্‌স্ যথাসম্ভব নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ঘটনাগুলি দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণীতে উক্ত মতবাদের কোনো সমর্থন পাওয়া যায় না। তা ছাড়া আরও অনেক সরকারি রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে হ্যাভেলকের পশ্চাদপসরণের সঙ্গে সঙ্গে তালুকদাররা স্ব-স্ব অনুচরবর্গ লইয়া সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। গোয়েন্দাবিভাগের অতি সুযোগ্য কর্মচারী পি, কার্ণেগির 'সিক্রেট লেটারস্'-এ এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য রহিয়াছে। পূর্ব ভারতের বিদ্রোহ সম্বন্ধেও একটা ইচ্ছাকৃত সীমাবদ্ধতা ভারত সরকারের ইতিহাসে ধরা যায়। আলোচনা না থাকাতে বিদ্রোহের বিস্তার ও এলাকার পরিধি সংকীর্ণভাবে দেখা হইয়াছে। নর্মদা অঞ্চলের কয়েকজন বিখ্যাত জননায়কের কার্যাবলীর উল্লেখ হয় নাই। মহারাষ্ট্রের কয়েকটি খণ্ড খণ্ড বিক্ষোভও বাদ পড়িয়াছে।

উপরিউক্ত কয়েকটি কথা অতি নিরর্থক মনে হইত যদি ভারত সরকারের ঐতিহাসিক বিশেষ কোনো দৃষ্টিভঙ্গির উপরে উঠিয়া বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনার দাবি না করিতেন। বস্তুত গ্রন্থকার অনেক ক্ষেত্রেই নিজের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে একটা সজাগ মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। ইহা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ ব্যক্তিত্বনিরপেক্ষ ইতিহাস সম্ভব নয়—বিদেশী রাজত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হিসাবে ১৮৫৭ সালের আন্দোলন পৃথিবী বিখ্যাত। এই সংকটের দিনে ইংলণ্ডের প্রতি সকলেরই সহানুভূতি সঞ্চার হইয়াছিল। সে সময়কার ইউরোপের ও আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহ পড়িলে দেখা যায় যে ইংরেজকে সাহায্য করিবার জন্য সারা ইউরোপে সক্রিয় উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছিল। স্বাধীনতার পীঠস্থান, ইংলণ্ডের শক্তি খর্ব হইলে, ইউরোপকে রক্ষা করিবার আর কোনো শক্তি থাকিবে না, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে বাণিজ্যবিস্তার ও পণ্যের বিপুল প্রসার ব্যাহত হইবে, এই আশঙ্কায় সমস্ত পাশ্চাত্য জগতে এক আলোড়ন পড়িয়া গেল। মধ্যযুগে মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য যে ধর্মোৎসাহ সংক্রামিত হইয়াছিল, সিপাহী বিপ্লবের প্লাবনে খৃস্টীয় জগতে দেখা গেল তখন একটা যুযুৎসু ভাব। ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ভারতীয় বিদ্রোহে ইংরেজ নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য যে ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল তাহার পিছনে ছিল একটা বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়। বিদ্রোহের কণ্ঠরোধ করিয়া ব্রিটিশ শক্তি ন্যায় ও সত্যের মর্যাদা সারা জগতে জাহির করিবে। নিজেদের দেশের প্রতি ভারতীয়দের দাবী অগ্রাহ্য করিবার নীতিবিরুদ্ধ প্রেরণার ভিত্তি

ছিল ব্রিটিশ শক্তির অবশ্যম্ভাবী জয়ের সুনিশ্চিত ধারণায়। যে বলে ক্রমওয়েল উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, যে শক্তি নেপোলিয়নের শক্তিকে ধূলিসাৎ করিয়াছিল, সেই উদাত্ত আদর্শ ও বলদীপ্ত যুদ্ধপ্রবণতা দেখা গেল নিকলসন, হ্যাভেলক ও ক্যাম্পবেল-এর সমর-অভিযানে। মিউটিন-সাহিত্যের কয়েকটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থে,—যেমন কে-ম্যালেসন, রেড-প্যাম্ফ্লিট, ফ্রবিস-মিচেল-এর গ্রন্থ—এই সজাগ মনোভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, যেহেতু তাহারা ইংলিশম্যান, সেই কারণে বিদ্রোহ দমন করা সহজসাধ্য হইবে।

এই বিপদের দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রতি সহানুভূতি কষ্টকল্পনা না হইলেও যুক্তিমূলক ছিল কিনা ভাবিবার বিষয়। সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া সিপাহী বিদ্রোহ দমন করা, রাজনৈতিক মতবাদ নিন্দনীয় না-ও হইতে পারে কিন্তু সেই সময়ে ইউরোপে পরাধীন পোল্যাণ্ড ও লম্বার্ডির প্রতি ব্রিটিশ শক্তি যে সহানুভূতিসূচক নীতি অবলম্বন করিয়াছিল তাহা স্ববিরোধী মনে হয়। বিদেশী শাসকের প্রতি বিরুদ্ধাচারণ করিয়া ভিন্ন দেশে তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার মধ্যে যে অসামঞ্জস্য আছে সে দিকে দৃষ্টি দিবার মতো উদার নীতি কখনও প্রসার লাভ করে নাই। ভারতীয়দের বিদ্রোহ যত অমার্জনীয় অপরাধই হউক না কেন, কোনো বিদেশী শক্তির প্ররোচনায় হয় নাই, নিজেদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ক্লেদ ও গ্লানি হইতেই ইহার উৎপত্তি। এই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিদ্রোহীরা ঐতিহাসিকের নিকট স্বীয় মর্যাদার দাবী করিতে পারে না কি?

সিপাহী বিদ্রোহে এ ধরনের দৃষ্টিপাতের অভাবই বিলক্ষণ দেখা যায়। উপরিউক্ত কোনো ইতিহাসেই বিদ্রোহীদের ধ্যানধারণা ও কার্যাবলীর বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। সেখানে ভীড় করিয়া আছে উত্তেজিত ব্রিটিশ রণনায়করা ও তাহাদের সাহায্যকারীরা। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ফরেস্ট যন্ত্রের সহিত নিম্নতম ব্রিটিশ সৈনিকের নামও তালিকাভুক্ত করিয়া তাহাদের অমর করিয়া রাখিয়াছেন, কেন না তিনি বিদ্রোহকে দেখিয়াছিলেন স্বদেশের দৃষ্টিভঙ্গিতে, ইংরেজদের জাতীয় জীবনের একটা 'নোবল এপিক' যাহার বাণী প্রতি ইংরেজের কর্ণকুহরে যুগ হইতে যুগান্তরে প্রতিধ্বনিত হইবে। কিন্তু কেহ ভুলেও স্বীকার করিল না এই কথা ভারতীয়দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যে অগণিত জনসমষ্টি বিদ্রোহে পদক্ষেপ করিয়া মিউটিনকে মহাবিদ্রোহে রূপান্তরিত করিল, তাহাদের ইতিহাস না লিখিলে ১৮৫৭ সালের ইতিহাস সম্পূর্ণ হইবে কি?

শশিভূষণ চৌধুরী

Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857. *By* Dr. Ramesh Chandra Majumdar. Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta. Rs. 15/-.

Eighteen Fiftyseven. *By* Dr. Surendranath Sen. Publications Division, Government of India, New Delhi. Rs. 5/-.

স মা লো চ না

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী—হুমায়ুন কবির। বেঙ্গল পাবলিশার্স। কলিকাতা, ১২। মূল্য দুই টাকা।

অধ্যাপক হুমায়ুন কবির তাঁর এই নতুন বইখানিতে বিশেষ নজর দিয়েছেন দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্গঠনের উপরে। যাকে বলা হয় শিক্ষা-তত্ত্ব সে-সম্বন্ধেও মাঝে মাঝে দুয়েকটি কথা তাঁকে বলতে হয়েছে; কিন্তু সেটি আনুষঙ্গিক ভাবে। তাঁর প্রধান বিবেচ্য—দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা বর্তমানে যে সংকটাপন্ন দশায় পৌঁছেচে তা থেকে তার উদ্ধার সাধন কি উপায়ে সম্ভবপর।

দেশের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক দুয়েরই অবস্থার শোচনীয়তা সম্বন্ধে অনেক কথা তিনি বলেছেন, সে-সব থেকে দুটি অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি :

"ছাত্র সমাজে বিক্ষোভ ও অসংযমের যে-সব বিবরণ আজকাল প্রায়ই শোনা যায় দেশের শিক্ষাবিদ ও নেতৃবৃন্দকে তা ভাবিয়ে তুলেছে।...সময় সময় শোনা যায় পরীক্ষার হলে নিরীক্ষকের উপর হামলা হয়েছে—কখনো কখনো শিক্ষক পর্যন্ত আক্রান্ত হয়ে মার খেয়েছেন।...অত্যন্ত তুচ্ছ কারণে এমন প্রলয় কাণ্ড ঘটে যায় যে ঘটনার আরম্ভ ও শেষের মধ্যে কোন সংগতি খুঁজে পাওয়া যায় না। স্কুল কলেজে ছাত্র-সংঘ বা ইউনিয়ন হবে কিনা, হলেও তার সদস্য সকল ছাত্রকে আবশ্যিক ভাবে হতে হবে, না হওয়া না-হওয়ার ভার প্রত্যেক ছাত্রের মর্জির উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত—এ প্রশ্নের সমাধানে শেষ পর্যন্ত গুলি চলেছে। সিনেমার টিকেট ছাত্রদের কম দামে দিতে হবে, এ-দাবির উপর সিনেমা ঘর লুট হয়ে গেছে। ছোট ছোট ঘটনার এ-পরিণতি দেখে এই কথাই মনে হয় যে ছাত্রসমাজ আজ বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যহারা।"

"রাজনৈতিক আন্দোলনের চক্রাবর্তে শিক্ষকের মর্যাদা কমেছে।...সাধারণ ভারতীয় পরিবারের আর্থিক আয়ের তুলনায় সেকালের শিক্ষকের উপার্জন নেহাত কম ছিল না। আজকাল ব্যবসায়-ব্যাণিজ্যে, দেশরক্ষা-বিভাগে এবং রাষ্ট্রীয় ও অন্তর্রাষ্ট্রীয় সরকারী চাকুরিতে নানা দিকে কাজের সম্ভাবনা বহুগুণে বেড়ে গেছে। সেসব কাজের তুলনায় শিক্ষাবৃত্তির আয় অত্যন্ত অল্প বলে সে সব ক্ষেত্রে যাদের স্থান মেলে না তারাই আজ বহু ক্ষেত্রে শিক্ষাব্রতী।...যুদ্ধের আগেও শিক্ষকের অবস্থা সচ্ছল ছিল না, কিন্তু তবুও কোনক্রমে তার দিন চলে যেত। যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধান্ত যুগে আজ শিক্ষকের পক্ষে জীবনযাত্রা দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে।...যারা অন্য উপায় করতে পারে নি তারাই বাধ্য হয়ে স্কুলে রয়ে গেছে। এখানে ওখানে হয়তো এ-কথার ব্যতিক্রম মিলবে, এমন শিক্ষক সৌভাগ্যবশত আজো আছেন যাঁরা শিক্ষাবৃত্তির প্রতি অনুরাগের ফলে অন্য কোনদিকে ঝোঁকেন নি, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। দেশের লক্ষ-লক্ষ শিক্ষকের এক বিপুল অংশ জীবনযুদ্ধে পরাজিত ও বিধ্বস্ত।...অসন্তুষ্ট ও হতাশ শিক্ষক যে সমাজের পক্ষে কত বড় বিপদ, বহু ক্ষেত্রে সমাজ আজো সে-কথা পুরোপুরি বোঝে নি।"

শিক্ষার ক্ষেত্রে, অথবা ব্যাপক ভাবে মানুষের জীবন-ক্ষেত্রে, এমন সংকট শুধু ভারতবর্ষে নয় বৃহত্তর জগতেও দেখা দিয়েছে—গত দুই মহাযুদ্ধ ও অন্যান্য বহু কারণে—সে কথা লেখক বলেছেন; আর সেই সঙ্গে তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন ভারতবর্ষে যে যে কারণে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ সংকট দেখা দিয়েছে সে-সবের উপরে। সেই কারণগুলোর মধ্যে চার শ্রেণীর কারণকে তিনি অগ্রগণ্য বিবেচনা করেছেন, সেই চার শ্রেণীর কারণ হচ্ছে : শিক্ষকের নেতৃত্ব লোপ; সমাজে অর্থসংকট; শিক্ষা-প্রণালীর গলদ এবং জনসাধারণের একটি বিরাট অংশের আদর্শচ্যুতি।

এই কারণ বা কারণ-শ্রেণীকে কবির সাহেব যে আমাদের দেশের শিক্ষা-সংকটের সব চাইতে বড় হেতু জ্ঞান করেছেন এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে কারো মতভেদ হবার সম্ভাবনা কম; তবে তিনি এই কারণগুলোকে যে পর্যায়ে সাজিয়েছেন সেই পর্যায়ে সবাই নাও সাজাতে পারেন।

যেমন, শিক্ষকের নেতৃত্ব-লোপকে তিনি সব চাইতে বড় কারণ বা বড় কারণ-শ্রেণী জ্ঞান করেছেন। কিন্তু 'শিক্ষকের নেতৃত্ব লোপ'কে এ ক্ষেত্রে সর্বাগ্র্যগণ্য জ্ঞান না করে 'জনসাধারণের একটি বিরাট অংশের আদর্শ চ্যুতি'কে সেই মর্যাদা দিলে সমস্যাটি আরো ভালো করে বুঝবার সুযোগ পাওয়া যায় বলেই আমাদের ধারণা—অবশ্য এই 'জনসাধারণের একটি বিরাট অংশের' অন্তর্ভূত জ্ঞান করতে হবে আমাদের রাজনীতিকদের, কেননা, একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে, তাঁদের দৃষ্টি-বিভ্রমই শিক্ষার ক্ষেত্রের এই অনর্থের মূল কারণ না হলেও খুব বড় কারণ। নেপোলিয়ন বলেছিলেন, একালে রাজনীতি হচ্ছে নিয়তি—La politique est la fatalite. তাঁর এই উক্তি যে একজন অসাধারণ দৃষ্টিমানের উক্তি একালের ইতিহাসের পাতায় পাতায় তার সাক্ষ্য মিলবে। স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতবর্ষের রাজনীতিকরা জোর দিলেন দেশের সম্পদসৃষ্টির পরিকল্পনার উপরে; সৎগত কাজই করলেন; কিন্তু হায়, সেই সম্পদ সৃষ্টি বলতে তাঁরা বুঝলেন প্রধানত খাদ্যদ্রব্য ও দৈনন্দিন সুখ-সুবিধার উপকরণের প্রাচুর্যসৃষ্টি—ভুলে গেলেন যে মানুষের উৎকর্ষ যদি না হয়, অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধি বিবেচনা আনন্দ উদ্দীপনা এসব যদি না বাড়ে, তবে প্রচুর খাদ্য ও সুখের উপকরণ মানুষের কোনো কাজেই আসে না।—রাজনীতিকদের এই একটি ভুল যে কত বড় অনর্থ দেশে ঘটিয়েছে সে-সম্বন্ধে যোগ্য চেতনা আজ পর্যন্ত দেশে দেখা দেয় নি। এই চেতনা দেখা দিলে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের যোগ্য নেতৃত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকে সবার মনোযোগ সহজেই আকৃষ্ট হবে, দেশের শিক্ষাও সংকট এড়িয়ে সহজপথে অগ্রসর হতে পারবে।

আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে চারটি অথবা চার শ্রেণীর বড় ত্রুটির নির্দেশ লেখক করেছেন সে-সবের মধ্যে কেবল 'শিক্ষা প্রণালীর গলদ' সম্বন্ধে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন নি, বোধ হয় এই কারণে যে, তাঁর মতে (আমাদের দেশের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের) "পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে আপত্তি করবার বিশেষ কিছু নাই বরং কেবল পাঠ্যক্রম বিবেচনা করলে পৃথিবীর যে কোনো দেশের সঙ্গে আমাদের পদ্ধতির তুলনা করা চলে"। তাঁর এই উক্তি প্রায় দুঃসাহসিক, কিন্তু মোটের উপর সমর্থনযোগ্য বলেই মনে হয়। তবু বুনিয়াদী শিক্ষা, সর্বস্তরের শিক্ষায় মাতৃ-ভাষার বা প্রাদেশিক ভাষার স্থান, হিন্দি ইংরেজি সংস্কৃত সর্বভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এই তিনের মূল্য ও মর্যাদা, ইত্যাদি নিয়ে যে সব জটিল সমস্যা বর্তমানে দেশে দেখা দিয়েছে সে সব সম্পর্কে তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতা আর সুচিন্তিত মতামতের সঙ্গে পরিচিত হতে পারা পাঠকদের জন্য লাভজনক। আশা করি বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণে এই সব সমস্যার দিকেও

তিনি মনোযোগ দেবেন।

মাধ্যমিক শিক্ষার বহুমুখিতা ও দীর্ঘতর কার্যকাল, তিন বৎসরে ডিগ্রি লাভ এ সবের সম্পর্কে তিনি যে সব যুক্তি দেখিয়েছেন তা মোটের উপরে মেনে নেবার যোগ্য; তবে নতুন মাধ্যমিক শিক্ষা অল্প দিনে ও যোগ্যভাবে যদি রূপ গ্রহণ করতে পারে, তবেই সার্থক হতে পারবে সমগ্র পরিকল্পনা। এই 'যদি' কিন্তু ছোটখাট 'যদি' নয়। শিক্ষকের লুপ্ত নেতৃত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যে সব প্রস্তাব তিনি করেছেন, যেমন, রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল, এঁদের দরবারে বা ভবনে শিক্ষকদের আমন্ত্রণ, শিক্ষকের বেতন-বৃদ্ধি ও 'টিউশানি'র বিলোপ, মাঝে মাঝে তাঁদের জন্য আনন্দময় পরিবেশে বিশ্রামের ব্যবস্থা, নতুন করে তাঁদের বিদ্যাচর্চার সুযোগদান ইত্যাদি, সে সবই উৎকৃষ্ট প্রস্তাব আর অগৌণে রূপদানের যোগ্য। তবে সে সবের মধ্যে আমরা সর্বাগ্রগণ্য জ্ঞান করি শিক্ষকদের জীবনধারণের উপযোগী বেতন দান। শিক্ষকদের জন্য কোনো বিলাসিতার কথা আমরা ভাবছি না, আমরা ভাবছি শিক্ষকদের ও তাঁদের ছোট খাট পরিবারের জন্য মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা। এটি যাকে বলা হয় irreducible minimum. কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরেও দেশের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি শিক্ষকদের এই দারুণতম প্রয়োজনের দিকে যোগ্য ভাবে আকৃষ্ট হয়নি। শিক্ষকদের, বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের, ভরণ পোষণের উপযুক্ত বেতন দিতে হলে বহু অর্থের—দশ বিশ কোটি টাকার—দরকার সে কথা কবির সাহেব তুলেছেন। কিন্তু দেশের সুশিক্ষার প্রয়োজনকে অন্য কোনো প্রয়োজনের চাইতে যদি আমরা ছোট করে না দেখি তবে এ ক্ষেত্রে সব রকমের অনাবশ্যক ভয় ও সংকোচ থেকে সহজেই আমরা অব্যাহতি পাব আর ন্যায়সংগত কি কি উপায়ে এই সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারবো সে পথও আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে দেখা দেবে। অপব্যয় দেশে যত রকমে চলেছে সে দিকে আমাদের চোখ পড়লেও শিক্ষকদের দুর্দশা নিবারণে আমরা অন্তরে নতুন ত্যাগিদ অনুভব করবো।

অবশ্য কোনো কোনো শিক্ষাবিদকে বলতে শুনেছি : মাইনে বাড়িয়ে দিলেও বর্তমানে যাঁরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক তাঁদের কাছ থেকে কাজ পাবার সম্ভাবনা কম। শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক অযোগ্য ব্যক্তির প্রবেশ-লাভ ঘটেছে, কবির সাহেবের বইখানিতেও সেকথা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এমন দ্বিধা সরকারের পক্ষে খাটে না। তাঁদের জন্য অবলম্বনীয় যা সঙ্গত ও সম্ভাবনাপূর্ণ সেই ব্যবস্থাই। যত বৈধ উপায়ে সম্ভব অযোগ্য ব্যক্তিদের তাঁরা শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে দিন, কিন্তু তারো আগে করুন শিক্ষকদের যোগ্য পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থা না করে আর যত ভাল ব্যবস্থাই তাঁরা করতে যাবেন সব ব্যর্থ হতে বাধ্য—এ বিষয়ে তাঁদের ভুল না হোক।

সুশিক্ষা দানের ও গ্রহণের উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি দেশে হওয়া চাই, একথার উপরে কবির সাহেব জোর দিয়েছেন, আমরাও দিচ্ছি। কিন্তু দেশের শাসনভার বর্তমানে যাঁদের হাতে সেই রাজনীতিকদের মনে এ-বিষয়ে যোগ্য চেতনার সঞ্চার করতে পারা হয়তো সেই পরিবেশ সৃষ্টি সম্পর্কে প্রথম কাজ। বহু শিক্ষা-কমিশন এদেশে বসেছে, বহু গুণী ব্যক্তি শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ কথা বলেছেন, কিন্তু কাজে এ-পর্যন্ত শিক্ষকদের ও শিক্ষার অবহেলা ভিন্ন আর কিছুই লাভ হয়নি। স্বাধীনতার জন্য যে কালে দেশে তীব্র আন্দোলন চলেছিল তখন বলা হতো Education can wait but Swaraj cannot. চিন্তা হিসাবে যদিও যথেষ্ট গোঁজামিল এই উক্তিতে রয়েছে তবু সেই তীব্র রাজনৈতিক সংঘর্ষের কালে এটিকে না হয় বরদাস্ত করা গিয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরেও দেখা যাচ্ছে

আমাদের রাজনীতিকদের মনোভাব বদলায় নি; আর না বদলাবার ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে কত বড় অনর্থ যে ঘটেছে যাদের চোখ একটু খোলা আছে তাদেরই তা চোখে পড়তে দেরী হয় না, কিন্তু রাজনীতিকদের চোখে তা যেন পড়তেই চায় না।

বোধ হয় তার বড় কারণ, রাজনীতিকদের চোখ সাধারণত খোলা থাকে না, তাঁরা চলেন ভারের বেগে—এটি হয়ত তাঁদের নিয়তি। শিক্ষার ভার যদি দেশের জনসাধারণ তাঁদের উপরে চাপাতে পারেন তবেই তাঁদের থেকে এ ক্ষেত্রে কিছু ভাল কাজ আশা করা যেতে পারে। কবির সাহেবকে ধন্যবাদ—তিনি দেশের শিক্ষার সংকটাপন্ন অবস্থার উপরে প্রচুর আলোকপাত করেছেন, অনেক ভাল পথের নির্দেশ দিয়েছেন। এখন জনসাধারণ, বিশেষ করে শিক্ষিত সাধারণ, এই সংকটের গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত হোন—তাঁরা উপলব্ধি করুন দেশের শিক্ষা ও শিক্ষকদের দুর্দশার অর্থ দেশের আশা-ভরসা-স্থল বালক বালিকাদের কিশোর কিশোরীদের অবিকাশ ও বিকৃতি, দেশের ভবিষ্যৎ তাতে বিপন্ন। অবশ্য স্কুল কলেজের শিক্ষা থেকেই যে দেশের লোকের সব শিক্ষা লাভ হয় না এটি জানা কথা; কিন্তু সেই সঙ্গে এটিও জানা কথা যে স্কুল কলেজের শিক্ষাই গোড়ার ব্যাপার—সভ্য জীবনের পত্তন তা থেকে—তাই তাতে বড় রকমের ত্রুটি ঘটলে পরে তা শোধরানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

বহু রকমের ত্যাগের ফলে আমাদের লাভ হয়েছে স্বাধীনতা—তার রক্ষা আর সমাক পুষ্টি-সাধন আমাদের প্রত্যেকের প্রধানতম কর্তব্য। মানতে হবে এই রক্ষা ও পুষ্টি সাধনের এক বড় উপায় হচ্ছে দেশে সুশিক্ষার প্রসার—দেশের কৃষি শিল্প বাণিজ্য স্বাস্থ্য শত্রুর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি এ-সবের কিছুরই সঙ্গে তুলনায় তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে শিক্ষার এতো বড় গুরুত্ব সম্বন্ধে জনচিত্ত সাবাহিত রাখা কঠিন, কেননা, সুশিক্ষা অশিক্ষা বা কুশিক্ষার ফল যদিও অবশ্যম্ভাবী তবু তা ফলে হাতে হাতে নয়—দেরীতে। দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা কার্যকরী অবস্থায় আছে কিনা সে-সম্বন্ধে সচেতন থাকার বড় দায়িত্ব আসলে দেশের বুদ্ধিজীবীদেরই; তাঁদের সচেতনতায় জনচিত্তে প্রেরণা জাগে আর তাই সাধারণত কর্মশক্তি জোগায় রাজনীতিকদের।

কাজী আবদুল ওদুদ

Middle East Crisis. *By* Guy Wint & Peter Cavalcoressi. Penguin. London. 2*s*.
Revolt on the Nile. *By* Col. Anwar El Sadat. Wingate. London. 12*s*. 6*d*.

সমস্ত পশ্চিম এশিয়া তথা মধ্যপ্রাচ্য আজ আঘাতে প্রতিঘাতে আলোড়িত; আশা আশঙ্কায় মথিত। তিনটি মহাদেশের সংযোগস্থল এই ভূখণ্ড; পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ তেলের ভাণ্ডার এর মাটির তলায়। কল্পনাতীত প্রাকৃতিক সম্পদ এই মধ্য এশিয়ার বুকে অথচ বর্ণনাতীত দারিদ্র্য এখানকার শতকরা ৯৫ জন মানুষের। এই দারিদ্র্য আরো অসহনীয় এবং অপমানকর, তার কারণ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও খবরদারী ব্যবস্থা পশ্চিম এশিয়াকে য়ুরোপের পত্তনীতালুক করে রেখেছে প্রায় এক শতাব্দী কাল। তবে আশার কথা এই যে, পরিবর্তন

সুরু হয়েছে। সমগ্র আরবভূমি বিদেশী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বিক্ষোভে প্রতিরোধে মুখর, চঞ্চল হয়ে উঠেছে। জয় পরাজয়ের হিসাব নিকাশ এখনো শেষ হয়নি, সহজে শেষ হবার নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে মধ্য এশিয়া থেকে পিছু হটতে হয়েছে, আপোষরফা করতে হচ্ছে। কিন্তু নূতন শক্তি সমাবেশের ফলে মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির স্বাধীন অগ্রগতির পথ আরো জটিল ও বাধাময় হয়ে পড়ছে। তার প্রমাণ জর্ডানে ও লেবাননে। তারও পূর্বে কূটনীতির খেলায় ইরানে ডাঃ মোসাদেকের জাতীয়তাবাদী সংকল্প ব্যর্থ করে বিদেশী মূলধনী স্বার্থের একচেটিয়া প্রভুত্ব আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একমাত্র ঈজিপ্ট এবং সিরিয়া এখন পর্যন্ত নিজেদের জাতীয়তাবাদী সংকল্প ও স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হবে বলা কঠিন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সময়টায় য়ুরোপই ছিল বৃহৎশক্তির দ্বন্দ্ব বিরোধের প্রধান কেন্দ্র। "ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন", "মার্শাল এড্" এবং কমিনফর্মের ঠাণ্ডা লড়াই ছিল য়ুরোপের ভাগদখল নিয়ে। তারপর দ্বিধা বিভক্ত য়ুরোপ মোটামুটি অচল অবস্থায় এসে ঠেকেছে—না-যুদ্ধ, না-শান্তির সহ-অস্তিত্ব আশ্রয় করে। এর পরবর্তী পর্বে বৃহৎশক্তির দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র হল পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে। কোরিয়া, ফরমোসা এবং ইন্দোচীন নিয়ে মার্কারী ধরনের সংঘর্ষ, বৃহৎশক্তির বেনামী লড়াই এবং ঠাণ্ডাযুদ্ধ চলেছিল ১৯৫৪ সন পর্যন্ত। সে সময়ে অনেকের মনে হয়েছিল তৃতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম রণাঙ্গণ হবে বোধ হয় পূর্ব এশিয়ায় চীনের সীমানা ধরে। শেষ পর্যন্ত এই অঞ্চলেও য়ুরোপের মত না-যুদ্ধ না-শান্তির অচল অবস্থা মেনে নিতে হয়েছে। এখন বাকী মধ্য এশিয়া—আলজেরিয়া থেকে পাকিস্থান পর্যন্ত বিরাট ভূখণ্ডটি কূটরাজনীতি এবং যুদ্ধজোটের লীলাভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুয়েজ যুদ্ধ এর একটি খণ্ড-চিত্র মাত্র। সুয়েজে ব্রিটিশ সাম্রাজিক শক্তির বিপর্যয় ঘটেছে বটে কিন্তু তার ফলে মধ্য এশিয়ার উপর বিদেশী শক্তির চাপ কমেনি বরঞ্চ বেশি হয়েছে।

"পেণ্ডুলাইন স্পেশ্যাল" সিরিজে গাই উইন্ট এবং পিটার কাভালকোরেসি মধ্য প্রাচ্য সংকটের পটভূমি, ঘটনাবলী ও কার্যকারণ বর্ণনা করেছেন। সংক্ষিপ্ত হলেও পুস্তিকাখানির তথ্যসংকলন মূল্যবান ও নিত্য ব্যবহারের উপযোগী। লেখক দুজন ইংরেজ হলেও অন্ধ বিদ্বেষপরায়ণভাবে আরব জাতীয়তাবাদী সংকল্পকে বিকৃত করে রোমহর্ষক চিত্র রচনা করেন নি; প্রেসিডেণ্ট নাসেরকে হিটলারের দোসর প্রতিপন্ন করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী অপপ্রচার এঁরা সমর্থন করেন নি; মধ্য প্রাচ্যের সংকট সোভিয়েট কমুনিষ্ট দুরভিসন্ধির ফলে সৃষ্ট হয়েছে এমনতর আজগুবী একতরফা যুক্তিও এঁরা ব্যবহার করেন নি। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৬ সনের জুলাই পর্যন্ত মধ্য প্রাচ্যের সংকট কী ভাবে বেড়ে উঠেছে তার আটটি পর্ব ভাগ করেছেন এই লেখক দুজন। (১) ইরানের তৈল, (২) ঈজিপ্ট বিপ্লব, (৩) ইংগ-ঈজিপ্ট চুক্তি নিয়ে বিরোধ মীমাংসা, (৪) বাগদাদ সামরিক জোট, (৫) ইসরেল, (৬) ঈজিপ্ট-সোভিয়েট সম্পর্ক এবং অস্ত্র সরবরাহ, (৭) ফরাসী হস্তক্ষেপ এবং (৮) আসোয়ান বাঁধ সম্পর্কে মার্কিন নীতির টানা-পড়েন—এই আটটি পর্বে মধ্য প্রাচ্যে সংকটের পরিচয়, সুয়েজ খাল নিয়ে বিরোধ যুদ্ধ এবং তার পরিণাম এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। তৃতীয় পরিচ্ছেদ সুরু হয়েছে "আইসেনহাওয়ার ডক্‌ট্রিনে"। গাই উইন্টদের বইয়ে এর আভাসমাত্র আছে; বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য সংকট যে আরো তীব্র হয়েছে তা খবরের কাগজ যাঁরা পড়েন সকলেই অনুভব করতে পারছেন। মার্কিন সোভিয়েট দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে লেখক দুজনের বক্তব্য ভারতে অনেকেরই সমর্থন পাবে মনে হয়। মধ্য প্রাচ্যে বৃহৎশক্তির একচেটিয়া প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা কারো পক্ষেই ভাল হচ্ছে না। কাম্মান

বন্দুক বিলি করে অথবা ছলে বলে কৌশলে যুদ্ধ জোটে টেনে এনে মধ্য প্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলির স্থায়ী কল্যাণ হতে পারে না। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং জনসাধারণের আর্থিক সামাজিক উন্নয়ন হল এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের প্রাথমিক দাবী ও দায়িত্ব। এরা মার্কিন শিবিরে না সোভিয়েট শিবিরে থাকবে শক্তি দ্বন্দ্বের এই নির্লজ্জ দরকষাকষি ও টানাটানিতে কেবল অশান্তি তীব্র হচ্ছে এবং দীর্ঘকাল ধরে দুর্গত শোষিত দেশগুলির জাতীয় উন্নতির পথ রুদ্ধ হচ্ছে। মার্কিন-সোভিয়েট নেতারা যদি মধ্য প্রাচ্যে অস্ত্রশস্ত্র বিলি বন্ধ করতে পরস্পর চুক্তি করতেন এবং এই অঞ্চলের দেশগুলির স্বাভাবিক বিকাশে সম্মানজনক ভাবে সাহায্য করতে রাজী হতেন তাহলে অনেক মারাত্মক অমঙ্গল সম্ভাবনা বিদূরিত হত। গাই উইন্টদের বই-এ এইরকম প্রস্তাবই করা হয়েছে। তবে এমনতর সাধু প্রস্তাব এই ঠাণ্ডাযুদ্ধের পৃথিবীতে গৃহীত হওয়ার আশা সামান্যই। মধ্যপ্রাচ্যের দুর্ভাগ্য এবং দুর্ভোগ আরো বৃদ্ধি পাবে এই আশঙ্কাই আপাততঃ প্রবল দেখা যাচ্ছে।

কর্নেল আনওয়ার আল্ সাদাৎ-এর বইখানি কতকটা আত্মকাহিনী এবং কতকটা ইজিপ্টের রাষ্ট্র-বিপ্লবের নাটকীয় চিত্র-সমাবেশ। আনওয়ার আল্ সাদাৎ প্রেসিডেণ্ট নাসেরের বিশ্বস্ত সহকর্মী ও অন্তরঙ্গ সুহৃদ। স্বয়ং নাসের এই বই-এর মুখবন্ধ লিখেছেন। ১৯৫২ সনের ২৩শে জুলাই যে তরুণ মিলিটারী অফিসার কয়েকজন ইজিপ্টে রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন ঘটান নাসের এবং সাদাৎ তাঁদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। ফারুকের সিংহাসন চ্যুতি এবং সামরিক বিপ্লব সমিতির তরফ থেকে নাগীব-নাসেরের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল ইজিপ্টের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা। এই ঘটনার পশ্চাৎপট এখনও প্রায় অজ্ঞাত অপ্রকাশিত রয়েছে। প্রেসিডেণ্ট নাসেরের একখানি ছোটো বই—"ইজিপ্টের মুক্তি"—বিপ্লবের উদ্দেশ্য এবং উদ্যোগ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য প্রকাশ করেছে। আনওয়ার সাদাতের কাহিনী তার পরিপূরক। ইজিপ্টের তরুণ মিলিটারী অফিসারেরা জাতীয়তাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুরুতে। রমেলের জার্মান বাহিনী যখন ইজিপ্টে ব্রিটিশ ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হচ্ছে তখন থেকেই নাসের, ওমর, সাদাৎ প্রমুখ তরুণ অফিসারেরা বিদ্রোহের জন্য গুপ্ত সংগঠনে অগ্রণী হন। সাদাতের কাহিনীতে এই সংগঠনের নানারকম দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার উল্লেখ আছে। নাগীবকে কখনও কি কারণে বিপ্লবী অফিসারদের মুখপত্র মনোনীত করা হয় সে বিষয়ে সাদাতের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা খুবই চিত্তাকর্ষক। নাসের পরিচালিত তরুণ মিলিটারী অফিসারেরা রাজনৈতিক আদর্শে সকলেই একমতাবলম্বী ছিলেন না, এটাও সুস্পষ্ট। ব্রিটিশ প্রভুত্বের উচ্ছেদ, রাজবংশের ক্ষমতা লোপ এবং সুযোগ-সন্ধানী ঘুষখোর রাজনীতির অবসান—এই তিনটি লক্ষ্য সম্পর্কে এঁরা ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। তবে সাদাৎ প্রমুখ কোনো কোনো উৎসাহী নেতারা নাৎসী আদর্শের পক্ষপাতী ছিলেন। আবার গামাল সালেম, মহীউদ্দীন এঁরা ছিলেন কমুনিস্ট মনোভাবাপন্ন। বিদ্রোহের প্রধান উদ্যোক্তা ও সংগঠক নাসেরকেই পুরোপুরি জাতীয়তাবাদী বলা যায়। ইজিপ্টের বিপ্লব একেবারে বিনা রক্তপাতে সংঘটিত হতে পেরেছিল তার কারণ জনসাধারণের অসহনীয় দুরবস্থা, ফারুকের মূর্খ দম্ভ ও বিশ্বাসঘাতকতা এবং সর্বোপরি জাতীয়তাবাদী ওয়াফদ নেতাদের দুর্বলতা। বিদ্রোহের নায়ক হিসাবে আনওয়ার আল্ সাদাৎ বেপরোয়াভাবে দুঃসাহসী এবং একনিষ্ঠ হলেও তাঁর লেখার ধরণ খুব বেশি উচ্ছ্বাসময়। তাঁর কাহিনীতে বিপ্লবের ঘটনাবলীর আলগা আলগা বর্ণনা আছে, বিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক পটভূমির বিস্তৃত পরিচয় একেবারেই নেই। ফলে বইখানি পড়লে মনে হয় অনেকটা আমাদের দেশের কোনো বিপ্লবীর আত্মকাহিনীর

মত। "মুস্লিম ভ্রাতৃসঙ্ঘের" উত্থান পতন সম্পর্কে সাদাতের বর্ণনা যথার্থ এবং নিরপেক্ষ বলা যায় না। বিশেষতঃ "মুস্লিম ভ্রাতৃসঙ্ঘের" সঙ্গে কমুনিস্ট মতাবলম্বীদের যোগাযোগ ছিল, সাদাতের এই অভিযোগ কষ্টকল্পিত মনে হয়।

সরোজ আচার্য

Roman Tales. *By* Alberto Moravia. Secker & Warburg. London. 12*s.* 6*d.*

মোরাভিয়ার লেখায় এতদিন মধ্যবিত্ত সমাজেরই নানা পরিচয় মিলেছে, এমন কি যেখানে পতিতার কাহিনী সেখানেও মধ্যবিত্তকেই দেখা যায়, কেন না মোরাভিয়ার পতিতার মতো মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তি জাত-মধ্যবিত্তের মধ্যেও দুর্লভ। ভদ্রলোক সমাজে ঠাঁই বজায় রাখার জন্য মধ্যবিত্তের যত প্রচেষ্টা, পতিতার মধ্যে ভদ্রসমাজের আইন-কানুন, রীতি-নীতি, বিশ্বাস-বিভীষিকা মেনে চলার আকুল আকাঙ্ক্ষা তার চেয়ে কম নয়, হয়তো বেশি।

"রোমান টেলস" বইয়ে কিন্তু মোরাভিয়া অবশেষে মধ্যবিত্তকে ছেড়ে সমাজের নীচু তলার লোক নিয়ে ভাবিত হয়েছেন। এখানে দেখি ট্যাক্সি ড্রাইভার, হোটেলের চাপরাশি, বস্তির বাসিন্দা আদি নানাবিধ লোকের ভিড়। মনে হয় কেবল মধ্যবিত্তকে নিয়ে লেখায় অরুচির ফলে মোরাভিয়া একটু হাওয়া বদলাতে চেয়েছেন।

হাওয়া বদলেছে সত্যিই, কিন্তু মন বদলায়নি। মোরাভিয়ার মতে মজুরশ্রেণীর মুখ দিয়ে তাদের সহজ ভাষা বলাবার প্রয়োজন নেই, কারণ তাতে বাহ্য বাস্তবতা থাকলেও বাস্তবিক জীবনের প্রকাশ হয় না। তাঁর চরিত্রেরা তাঁর কলমের মারফৎ কথা বলে—সেই সাহিত্যের ভাষায় তাদের চরিত্রের আরো স্পষ্ট প্রকাশ।

আসলে কিন্তু মোরাভিয়া নিজের মধ্যবিত্ত জমি ছাড়তে রাজী নন। তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্যই হল নিস্পৃহ ভাবে জীবনে যা ঘটে তাকে দেখে যাওয়া, কোনো মন্তব্য, উষ্মা বা সুখ-দুঃখের মধ্যে তিনি নেই। বাহ্যত এটা খানিকটা ইতালীয় চলচ্চিত্রের নিও-রিয়ালিজমের মতো। সেখানেও দেখাটাই প্রধান, মন্তব্য উহ্য থাকে অথবা প্রায় থাকেই না। যেখানে লেখকের নিজের আবেগের আধিক্য ঘটে সেখানে অনেক সময় বাস্তব অস্পষ্ট হয়ে যায়, তার বিশুদ্ধতা ও স্পষ্টতা থাকে না। সমকালীন বাংলা সাহিত্যে এটা বিশেষভাবে দেখা যাচ্ছে। নিও-রিয়ালিজমে বা মোরাভিয়ার গল্পে উপন্যাসে পরিচালক বা লেখক নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখেন, শুধু দেখা ছাড়া সেখানে কিছু নেই। অনেক সময় এর ফলে ছবি বা লেখা আরো বাস্তব, দর্শক বা পাঠকের আরো নিকট হয়, মন্তব্যের অভাবে জীবনের সুখ-দুঃখ আরো তীব্রভাবে দেখা দেয়। মোরাভিয়ার লেখায় নিও-রিয়ালিস্ট ছবির মতোই একটি অনুদ্বেজিত সমাহিত ভাব আছে যা জীবনের পরিচয়কে আরো নিকট করে আনে। তা ছাড়া মোরাভিয়ার গল্পে সুন্দর একটি সম্পূর্ণ রূপ ফোটে, প্রতিটি ছত্র সংযত, লেখা যত্নশীল, নিখুঁত। গল্পের কল্পনাও মনোহারী।

কিন্তু নিও-রিয়ালিজমের পিছনে মানুষের জন্য যে প্রচ্ছন্ন অতএব আরো গভীর বেদনা আছে, মোরাভিয়ার লেখার মধ্যে তা খুঁজতে গেলে হতাশ হতে হয়। এখানে নিস্পৃহতা

যেন বাহ্য নয়, আন্তরিক। দর্শকের নিরপেক্ষতা প্রায় ক্যামেরার যন্ত্রবৎ নিরপেক্ষতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্যামেরা যতক্ষণ মানুষের দ্বারা চালিত হয় ততক্ষণ তারও একটা মন থাকে, দৃষ্টিভঙ্গী থাকে। মোরাভিয়া পড়ে মনে হয় যেন মানুষের সম্বন্ধে তাঁর একটি সুচিন্তিত কৌতূহল আছে, যেমন গাছপালা সম্বন্ধে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীর বা হাড় রক্ত মাংস সম্বন্ধে শরীর-বিজ্ঞানীর। মানুষের কী হবে তা নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা নেই। নিও-রিয়ালিজমের প্রধান চিন্তা মানুষের গতি নিয়েই, তাই সেখানে মন্তব্যের অভাব সংযমের রূপ নিয়ে অন্তরের বেদনাকে আরো গভীর করে। সেখানেও ঘটনার দৌড় নিয়ে পরিচালকের কোনো উত্তেজনা নেই, কিন্তু দর্শকের মনে সেই ঘটনা যে ভাব আনে সেটা মানুষের সম্বন্ধে মমতা, তার ভবিষ্যতের বিষয়ে উৎকণ্ঠার ভাব। মোরাভিয়ার নিরপেক্ষতা দর্শকের মনে নিস্পৃহতা আনে। অনুবীক্ষণের মধ্য দিয়ে বাঁজাণুর গতিগতি দেখে যেন মন শুদ্ধ জীবনের অমোঘ গতির সম্বন্ধেই সচেতন হয়, যাদের জীবনকে নিয়ে সেই গতি, তাদের সম্বন্ধে কোনো প্রীতি জন্মায় না।

কেবল একটি গল্পে মোরাভিয়া হঠাৎ যেন অন্য কেউ বনে গিয়েছেন। 'দি বেবি'র কাহিনীই মোরাভিয়ার ধরনের নয়, ভাবপ্রবণ ঘটনার ছক-সাজানো অথচ অত্যন্ত জোরালো ক্ল্যাসিক্যাল গল্প যার শেষের কাছাকাছি এলে বোঝা যায় যে এইবার গল্প শেষ হতে বাধ্য (মোরাভিয়ার অনেক গল্পের শেষে কোনো 'শেষ' নেই)। লেখকের নিজস্ব ঢঙে নয় বলেই এ গল্পতে যথেষ্ট মমতা থাকলেও শেষ পর্যন্ত চমকই লাগায়। শিল্প-সাহিত্যে স্বধর্মে নিধনও শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ, তা পরধর্ম যতই মহৎ হোক না কেন। মোরাভিয়ার নিস্পৃহতা সত্ত্বেও তাঁর গল্প আমাদের ভালো লাগে কারণ তাতে বাস্তব জীবনের ছবি দেখতে পাওয়া যায়, বাস্তব চরিত্রের সঙ্গে মোকাবেলা হয়, যদিও তাদের প্রতি ভালবাসা জন্মায় না। কিন্তু যেখানে তিনি স্বধর্মের নিস্পৃহতা ছেড়ে মহৎ সাহিত্যের করুণার দিকে ঝুঁকেছেন, সেখানে অন্য কারো করুণার প্রকাশই আমাদের শ্রেয় বলে মনে হয়।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

সুয়োরাণী—বিমল মিত্র। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। কলিকাতা, ১২। মূল্য দুই টাকা আট আনা।

দ্বিতীয় জন্ম—অসীম রায়। বাক্। কলিকাতা, ১২। মূল্য তিন টাকা।

বনভূমি—বিমল কর। ত্রিবেণী প্রকাশন। কলিকাতা, ১২। মূল্য তিন টাকা।

বসন্ত পঞ্চম—নরেন্দ্রনাথ মিত্র। নাভানা। কলিকাতা, ১৩। মূল্য দুই টাকা আট আনা।

উচ্চাশার আঙুর ফল ঈষৎ দূরবর্তী হলেও অধুনা দুর্লভ নয়। ফলে আত্মপ্রত্যয় সহজলভ্য। এ বিশ্বাস লেখক মনে দৃঢ় মূলে। এ-কারণে মূল্য বিচারে তারা সংশয়ী। হয়ত বা অপারগ। বাণিজ্যিক মানসিকতার সম্প্রসারণে আমাদের জীবনের প্রতিষ্ঠিত মূল্যগুলি পরিত্রাস্ত। অথচ নূতন মূল্যবোধ তার স্থলাভিষিক্ত হয়নি। সাম্প্রতিক অপেক্ষাকৃত প্রাগ্রসর জীবনে পুরাতন প্রেক্ষিতের দিকে সতৃষ্ণ তির্যক দৃষ্টি স্বভাবতই তাই আমাদের মনে সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি করে। যেহেতু আমাদের সমাজজীবনের গতি বহু বর্জন

এবং নূতন কিছু গ্রহণের পথে, সেই কারণে পুরাতন, এবং সেই পুরাতন যদি পূতিগন্ধময় হয়, তার সাগ্রহ পুনরুদ্ধার আমাদের লজ্জা, বস্তুত শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায় একথা অনস্বীকার্য।

এ অভিধা তর্কাতীত যে, উপন্যাস অথবা গল্প একটি সুষ্ঠু মূল্যবোধ প্রসূত। যদিও সর্বক্ষেত্রে লেখকমনের মূল্যবোধের সঙ্গে সমাজ জীবনের সাযুজ্য প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছা দুরাশা মাত্র। কারণ অবভাসে তা সংশয়প্রবণ। তবু নিঃসন্দেহে বলা চলে, এমন কি বিমূর্ত শিল্পকর্মের ক্ষেত্রেও যে, কাল ও সময়ের পরিধি নির্ণীত সমাজ জীবনের বোধ, ধারণা ও অনুভূতির অবর্তমান অসম্ভব।

অবশ্য এ নিয়মের ব্যতিক্রম সম্প্রতি প্রত্যক্ষ করা দুরূহ নয়। লেখক মনের চিন্তাধারায় যা কিছু অসৎ, তার কষ্ট বর্ণনায় অতীত প্রেক্ষিতের পুনরুদ্ধার অনেক সময় আশাতীতভাবে কার্যকরী হয়েছে। আসলে মানুষের মন এখনও সম্পূর্ণ পরিশীলিত নয়। ফলে, রস পরিবেশনে কটু রসের মাত্রা অধিক হলেও তাতে লোকসানের কারণ ঘটে না।

এই বিচারে বিমল মিত্রের সাফল্য আশাতীত। তাঁর "সাহেব বিবি গোলাম" উপন্যাস-এর সার্থকতাও এই অন্ধকারে নিমজ্জনের মধ্যে। মানসিক এই অবক্ষয় কোনক্রমেই শিল্পকর্মীর কর্তব্যে যাথার্থ্যের দাবী করতে পারে না। আশ্চর্যের বিষয় "সাহেব বিবি গোলাম"-এর প্রশংসনীয় দিকগুলিও লেখকের মন থেকে অধুনা নির্বাসিত। মনে হয় এই পরিণতি নিয়মের অনুগ। তার কারণ নিঃসন্দেহে উক্ত গ্রন্থের আপাত সাফল্য। অবশ্য তা ব্যবসায়িক সাফল্য।

অতএব, তার পরবর্তী গ্রন্থগুলি সেই ত্রুটির অন্ধকার বিবরেই সমাসীন। "সুয়োরাণী" এই বক্তব্যের একটি নিদর্শন।

উপন্যাস রচনার গতানুগতিক রীতিও যেন বিমল মিত্র মানতে নারাজ। আগাগোড়া উপন্যাসে তাঁকে একজন উঁচু দরের কথক ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। শিথিল বাক্য-বিন্যাস, ঘটনার অসংগতি, সর্বোপরি চরিত্র রচনায় দুর্বলতা অনেক সময় দুর্বহ বোধ হয়। উপন্যাসের পুরানো রীতি অনুসরণ করলে চরিত্র-বিস্তৃতি একটি মুখ্য অংশ গ্রহণ করত। কিন্তু কোথাও তার সাক্ষ্য মেলা বর্তমান গ্রন্থে সম্ভব নয়।

সাহেব-বৌদি আলোচ্য উপন্যাসের কেন্দ্র-চরিত্র। অলোকেশদার বাড়ি থেকে শুরু করে কলকাতার উন্মত্ত হোটেল, পল্লী বিশেষের ভাড়া-করা ঘর, ইউনুফের সঙ্গে পরিচয়, কুমার সাহেবের উড স্ট্রীটের বাড়ি, বড়ে মহারাজার রানী সাহেবা হওয়া পর্যন্ত নানা ভাবে নোরা মিত্রকে দেখেছি নানান পরিবেশে। এবং এর সবগুলিই সাধারণ মানুষের জীবন থেকে এতদূরে যে, রঙের গুরুত্ব কোথায় উজ্জ্বল, কোথায় নয়, তার পরিমাপ করা সম্ভব নয়। ফলে অধিকাংশ সময়েই চরিত্রগুলি আমাদের ফিকে মনে হয়। "সুয়োরাণী"র আলোচনা প্রসঙ্গে বহু আগে সন্তোষকুমার ঘোষ লিখিত ষষ্ঠ কন্যা গল্পটির কথা মনে হয়। উক্ত গল্প এবং আলোচ্য উপন্যাসের বক্তব্যের একস্থানে অদ্ভুত মিল আছে। অথচ মনোভঙ্গীর কত পার্থক্য। আর সেই গল্প পাঠকালে স্বতই মনে হয়েছে, মানুষ সম্পর্কে ধারণা উক্ত লেখকের কত স্বচ্ছ। জীবনের মূল্যগুলি তার মনে কত স্পষ্ট। সন্তোষকুমার ঘোষের প্রয়োজন হয়নি, নোরা মিত্রকে আবিষ্কার করার।

বিমল মিত্রের এই নঙর্থক ভাবাদর্শ আর যাই হোক, সার্থক শিল্পকর্মের ভিত্তি হতে পারে না।

অপেক্ষাকৃত তরুণ, এবং স্বল্প সাহিত্যিক যশপ্রাপ্ত অসীম রায়ের "দ্বিতীয় জন্ম" এক অন্য সুরে বাঁধা। যদিও এর অনেক ত্রুটি চোখে পড়বে, সুরটি মনে হবে অনেক সময় বেখাপ্পা, তবু একটি বিশেষ এবং প্রত্যক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী যেন গ্রন্থটির মান অনেকখানি উন্নত করেছে। জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বোধ যাঁরা করেন, লক্ষ্য করার বিষয়, তাঁদের কখনও সমস্যাগুলিকে খুঁজে, হাতড়ে বেড়াতে হয় না।

সোনা, মিনু, রমেন—এমন কি সমুদ্রপারের নীলা, এরা আমাদের পরিচিত। জীবনের অগণিত ব্যর্থতা সত্ত্বেও জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা এবং তার জন্য সংগ্রাম হাস্যকর নিঃসন্দেহে। কিন্তু তার ঔজ্জ্বল্যও প্রশংসনীয়। এই চেনা মানুষ, এই চেনা পৃথিবী এবং চেনা গণ্ডীর সন্তাপ যে—একাত্মবোধ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে, যা একমাত্র শিল্পের দ্বারাই সম্ভব, তা শুধু লক্ষ্যবিন্দুতে শেষ নয়। নূতন বিন্দু, নূতন মূল্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার পাথেয় মাত্র।

ভরসার কথা, অসীম রায় এইটুকু সম্যক প্রত্যক্ষ, বস্তুত, উপলব্ধি করেছেন। ফলে যক্ষ্মা রোগী সোনা, সংসারের পেষণে ক্লান্ত মিনু, ক্লিষ্ট জেঠাইমা এবং একেবারে আধুনিক বাস্তবানুগ মানুষের মনের ছাপ-মারা রমেন, এরা আমাদের সামনে জীবন্ত উপস্থিত।

প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা প্রয়োজন, সমুদ্রস্নানের ঘটনাটুকুর অবতারণার কোনো প্রয়োজন ছিল না। প্রায়-মৃত্যুর ওই অভিজ্ঞতাটুকু অসীম রায় পরিত্যাগ করলেই পারতেন।

গোষ্ঠী এবং গোত্রের বিচারে বিমল কর সম্পূর্ণ ভিন্ন। যাঁরা তাঁর অধুনা গ্রন্থগুলি পাঠ করেছেন, তাঁরা এ বক্তব্য সম্যক উপলব্ধি করবেন। "বনভূমি" উপন্যাসটি "ঝড় ও শিশিরের" নূতন সংস্করণ। মানুষের স্বাভাবিক দুঃখ, বেদনা বিমল করের উপন্যাসেরও উপকরণ। কিন্তু তার বিন্যাস ঘটনাকেন্দ্রিক ততটা নয় যতখানি মানসকেন্দ্রিক।

ফলত সূর্যশংকর, বনলতা, পদ্ম, অমর ও হেমন্তবাবু, হীরা, এদের সকলের সমস্যাই মনের। কিন্তু সর্বত্র তা সামাজিক নয়। অবশ্য এমন মূঢ় আমি নই যে ঘোষণা করব, সামাজিক সমস্যার রূপায়ন শিল্পকর্মের অত্যাবশ্যক অঙ্গ। তবু উল্লেখ করা উচিত যে, সমাজ জীবনের ভাব ও ধারণার বাহিরে যাওয়ার দায় অনেক।

এ উপন্যাসের উল্লেখ্য দিক হল, লেখকের নূতনতর লিখন-রীতি। এই গ্রন্থে কেন্দ্র চরিত্র বলতে কিছু নেই। তাই তার বিস্তৃতি বা বিন্যাসের প্রশ্ন অবান্তর। লেখকের মন যেন খরস্রোত। তার দুধারে রয়েছে অনেক কথা, অনেক মুখ। হীরার চরিত্র একটি সুন্দর সৃষ্টি।

উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা দুর্বল অংশ হল, কুসুম ও সুধাকরের আখ্যানভাগ।

উপন্যাস রচনায় আমাদের লেখকদের ব্যর্থতা সত্ত্বেও, ছোট গল্পের জন্য শ্লাঘা বোধের কারণ আছে। গত কয়েক বছরে গল্প-লেখকগণের কাছ থেকে আমরা কিছু উৎকৃষ্ট রচনা পেয়েছি। এদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। যদিও এ'রা দু'জন দুই ভিন্ন জাতের। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মন জীবনের খণ্ড বিচারে প্রত্যয়ী নয়। জীবনের নানা অন্ধ গলির আবর্জনা পেরিয়ে একটি সরস দিকের সন্ধান তিনি লাভ করেন। সে-কারণে তাঁর গল্পের চরিত্রগুলি এক বিশেষ অর্থে মূল্যবান।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সাম্প্রতিক গল্পগ্রন্থ "বসন্ত পঞ্চম" বাংলা ছোট গল্পের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। গল্পগুলির বিন্যাসে কোথাও কষ্ট কল্পনার প্রশ্রয় নেই। চরিত্রগুলির বিহার অতি স্বচ্ছন্দ। এর মধ্যে বিশেষ করে জামাই, বসন্ত পঞ্চম ও মহড়া—গল্প তিনটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

নৃপেন্দ্র সান্যাল

লখিন্দর—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। লোকায়ত সাহিত্যচক্র। কলিকাতা, ১২। মূল্য আড়াই টাকা।
নাবী ফসল—সুনীল চট্টোপাধ্যায়। সিগনেট বুক শপ। কলিকাতা, ১২। মূল্য দুই টাকা।

ওয়ার্ডস্বার্থ তাঁর নিজের একটি কবিতা সম্পর্কে একবার বলেছিলেন যে, তাঁর কবিতাটি 'বেশ-ভালো'র চাইতে যদি বেশি কিছু না হ'য়ে থাকে, তবে তা খুবই খারাপ হয়েছে; মাঝামাঝি কোনো কিছু হ'তে পারে না।

পৃথিবীর যে অংশে এবং যে কালে আমাদের বাস, ওয়ার্ডস্বার্থ তার বাসিন্দা হ'লে হয়তো বিপরীত মন্তব্য করতেন। রবীন্দ্রোত্তর তথা অতি-সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা প্রসঙ্গে তিনি হয়তো বলতেন, 'মাঝারি-ভালো' বা 'মাঝারি-বেশ-ভালো'র চাইতে বেশি কিছু হওয়া সম্ভব নয়।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, খুব ভালো বা খুব খারাপ কবিতা এখন লেখা হচ্ছে না। যা হচ্ছে সবই মাঝারি জাতের। খুব খারাপ কবিতা লেখা হচ্ছে না, এটা নিঃসন্দেহেই সুখের কথা। কিন্তু এ কথা বলার অর্থ এই যে সাম্প্রতিক কবিরা একটি ঐশ্বর্যবান কাব্য-ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হওয়ার ফলে খুব খারাপ কবিতা কিছুতেই লিখতে পারবেন না; চেষ্টা করলেও না। কবিতা লেখার জন্য যে সমস্ত উপাদানের একান্ত প্রয়োজন, সেই ভাষা, ছন্দ, ইত্যাদি তাঁদের আয়ত্তে। ফলত, তাঁদের সতর্ক, আঙ্গিক-নিষ্ঠ, পরিচ্ছন্ন লেখনী প্রতি মুহূর্তেই লেখা যাতে খারাপ না হয়, তার জন্য যতটা সচেষ্ট, লেখা যাতে আরো ভালো—আরো বিশিষ্টরকমের ভালো হয়—সেদিকে মনোযোগ দিতে পারে না। সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে তাই 'মন্দ না' পর্যায়ের সৃষ্টি যত হচ্ছে, সে তুলনায় নিজস্বতা-চিহ্নিত ভালো লেখা তেমন হচ্ছে না।

তিরিশের যুগের 'আধুনিক' প্রবীণ কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্তির যে প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, নতুন ধরনের কবিতা লিখবার যে আন্তরিক প্রয়াস ধ্বনিত হয়েছিল তাঁদের রচনায়, সাম্প্রতিক ও অতি-সাম্প্রতিক কবিদের মধ্যে তার অভাব দৃশ্যমান। এখনকার কবিরা সেই সব বয়োজ্যেষ্ঠ আধুনিক কবিদের নিরাপদ আশ্রয়ে লালিত হবার জন্য ব্যাকুল। পূর্ববর্তীদের প্রভাব এড়াতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই, প্রথম প্রথম না এড়ানোটাই মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ, কিন্তু সেই প্রভাব স্বাঙ্গীকরণের পর নতুন ধরনের কবিতা লিখতে প্রয়াসী হবো না কেন? নিজের বৈশিষ্ট্য, মৌলিকত্বকে কবিতায় ফুটিয়ে তুলতে, তাতে না হয় কাব্যসৌন্দর্যের কিছু হানি হলোই বা, সাহসী হবো না কেন? এই সাহসী মনোভাবের অভাবের ফলে প্রেমেন্দ্র মিত্র-জীবনানন্দ-অমিয় চক্রবর্তী-বিষ্ণু দে-বুদ্ধদেব প্রমুখের কর্মকৃতির প্রতিধ্বনি সাম্প্রতিক কবিদের রচনায় বিভিন্নভাবে শ্রুত। পূর্ববর্তীদের যান্ত্রিক অনুসরণ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হ'তে পারছেন না ব'লেই সাম্প্রতিকরা মোটামুটি সকলেই ভালো কিংবা বেশ-ভালো লিখছেন, কিন্তু তার বেশি কিছু তাঁদের সতর্ক কুশলী লেখনী থেকে উৎপন্ন হচ্ছে না। যে দুটি কাব্যগ্রন্থ সম্প্রতি পেলাম, তাতেও সেই অক্ষমতার পরিচয় পেলাম। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিকর্মের প্রতি আমার আস্থা ও শ্রদ্ধা আছে। মনকে নাড়া দেবার মতো প্রজ্ঞাস্পর্শী কোন কবিতা এখনও পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে না পেলেও তাঁর কাব্যচর্চার সততা অভিনন্দনযোগ্য। সেই সততার স্বাক্ষর "লখিন্দর" নামে তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মধ্যবিত্ত জীবনের পাঁচালীকার; মধ্যবিত্ত জীবনের দুঃখবিষাদ বিচিত্রভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। বর্তমানের শ্রেণীবিষম সমাজব্যবস্থার নির্মমতায়

আমাদের জীবন থেকে আনন্দ-আবেগ পলায়মান, তবু আমরা অজ্ঞেয় অসীম প্রাণশক্তির তাড়নায় এখনো সেই আনন্দের মায়ামৃগের পশ্চাদ্ধাবনে বিরত হইনি, কারণ পরিণামে তাকে বন্দী করতে পারবো ব'লে আমরা বিশ্বাস করি। দুঃখ-বিষাদের রূপকার হ'য়েও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাই আনন্দের আরাধক। তাঁর দুঃখের কালি-পড়া চোখে এখনো তাই লেগে আছে প্রাক্তন আর ভবিষ্যতের স্বপ্নাঞ্জন; বুকে আছে অটল বিশ্বাস। 'বেহুলা' তার একটি উল্লেখ্য দৃষ্টান্ত।

রূপকল্পের দিক দিয়ে "লখিন্দর"-এর অনেক কবিতাই সার্থক। রচনাসৌষ্ঠব, দৃঢ়পিনদ্ধ বাক্যবিন্যাস, সংহতি, কথ্যভাষার সুষ্ঠু ব্যবহার, নতুন শব্দের প্রয়োগ, উপমা ব্যবহারের অভিনবত্ব ইত্যাদি গুণ তাঁর কবিতায় খুঁজলে পাওয়া যায়। আধুনিক নগর-জীবনের শরিক ব'লে তাঁর 'ইমেজ'-এ নাগরিকতার স্পর্শ এসে লাগে। মেঘের সঙ্গে রথ, ভেলা ইত্যাদির পরিবর্তে শহুরে যান 'ফিটন' একাত্ম হ'য়ে যায়। ফলে, তিনি সহজেই বলতে পারেন : 'কালো মেঘের ফিটন চ'ড়ে কালিঘাটের বস্তিটাতেও আষাঢ় এলো।' এ প্রসঙ্গে সমর সেনের সঙ্গে তাঁর সাধর্ম্য লক্ষণীয়।

"লখিন্দর"-এ ত্রুটিও কিছু কিছু আছে। কয়েকটি জায়গায় চেষ্টাকৃত অভিনবত্ব বর্তমান। 'যুগল আলোর স্তন', 'চুলের আবীর', প্রভৃতি এর প্রমাণ। 'মিতা' কথাই যথেষ্ট, 'মিতেনী' অপ্রয়োজনীয়। 'মিতেনী'র শব্দসৌকর্যও সুখপ্রদ নয়। 'বিবর্ণ রৌদ্রের মৃতদেহ'-র মধ্যে অ্যাকস্ট্র্যাকশান-এর পরিমাণ অত্যন্ত বেশি এবং তা কোনোরকম হৃদয়গ্রাহীও হয়নি।

ছন্দের ব্যাপারে বলতে হয় কবি মাঝে মাঝে অমনোযোগিতার পরিচয় দিয়েছেন। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা 'সূর্যমুখী' কবিতাটির প্রতিটি স্তবকেই যুগ্মবর্ণের ব্যবহারে যে আশ্চর্য ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি হয়েছিল, তা অষ্টম এবং শেষ পংক্তিতে রক্ষিত হয়নি। 'গানে গানে ধুয়ে যায়' বা 'আলো-মুখে ঝরে পড়া'—একটিও যুগ্মবর্ণ এই পংক্তিদ্বয়ে নেই, অথচ অন্যসব পংক্তিতে যুগ্মবর্ণের উপস্থিতি লক্ষণীয়। ফলত আলোচ্য পংক্তিদ্বয়ে কবিতাটি বৈচিত্র্যহীন মনে হয়। কবিতার চালে আঘাত পড়েছে।

'বেহুলা' কবিতার প্রথম ও শেষ চরণে কবি 'জাগবে' ও 'জাগবেই'-কে যথাক্রমে দুই ও তিন মাত্রা ধরেছেন। এতে আপত্তি নেই। কিন্তু কবিতাটি একাধিকবার পড়লে দেখা যায় প্রথম চরণের পাঠ যতটা অনায়াস শেষেরটার পাঠ তা নয়। কারণ প্রথম চরণে 'সে জাগবে। জাগবেই। আমি'-র পর যতি পড়ছে এবং তা যথারীতি আট মাত্রার পরেই পড়ছে কিন্তু শেষ চরণে যতি পড়ছে 'সে জাগবে, জাগবেই, লখিন্'-এর পরে অর্থাৎ ন' মাত্রার পরে; '-দর সে আমার' নিয়ে দ্বিতীয় পর্ব গড়ে উঠেছে। অবশ্য 'সে জাগবে, জাগবেই' নিয়ে যদি একটি পর্ব করা যায় বা প্রথম ছ'মাত্রার পর যতিস্থাপন করা যায়, তাহ'লে পাঠ কিছুটা অনায়াস হ'তে পারে। কিন্তু অমন নিটোল কবিতার সহজপ্রবহমানতা তাহ'লে নষ্ট হয় এবং কবিতার প্রাণস্ফূর্তিও কিছুটা ব্যাহত হয়।

"লখিন্দর" সম্পর্কে আরেকটা কথা উল্লেখ না ক'রে পারছি না। চিত্রকল্প রচনাও যে কবির একটি প্রধান কর্তব্য, "লখিন্দর"-এর কবি সে বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগী নন; কিংবা সেদিকে তাঁর প্রবণতাই নেই। অনেক কথা ব'লে যা হয় না, একটি সার্থক চিত্রকল্প রচনাতে তাই সম্ভব। "লখিন্দর"-এ, দুঃখের বিষয়, স্মরণযোগ্য চিত্রকল্পের সাক্ষাৎ একবারও পেলাম না। এর কবি শত দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁর রোম্যাণ্টিক মনকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, কিন্তু সেই মনের পরিচয় মুখ্যত বাক্যবন্ধে যতটা সরব, চিত্রকল্পের মাধ্যমে ততটা প্রকাশিত নয়। তা

ছাড়া, বক্তব্যের ব্যাপারেও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কোনো কোনো কবিতা পৌনঃপুনিকতায় বিবর্ণ এবং নিরুত্তাপ মনে হয়েছে।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো "নাবী ফসল"-এর কবি সুনীল চট্টোপাধ্যায়ও বাচনপ্রধান কবি। 'চোখ তার ভরোভরো ভাদরের রাধার মতন' বা 'সেই সব নারী—প্রতিপদের চাঁদের মতো যাদের শরীর'-এর মতো গোটা দুই-চার উল্লেখ্য চিত্রকল্প থাকলেও মোটের উপর "নাবী ফসল"-এর কবি তাঁর পাঠককে দেখানোর চাইতে শোনাতে চান বেশি।

সুনীল চট্টোপাধ্যায় প্রধানত কামনাবেগনির্ভর কবি। তাঁর প্রেম, তাঁর ভালোবাসা ভীরু নয়, সাহসী; ক্ষীণকণ্ঠ নয়, সোচ্চার; শীতল নয়, উষ্ণ, উত্তপ্ত। তাঁর জীবনবোধ গভীর, তাঁর প্রেম তীব্রতপ্ত।

'দেহবাদী' ব'লে আখ্যাত বাংলা কবিতার বিশিষ্ট ধারাটি আজ ক্ষীণপ্রায়। অথচ আদিকাল থেকে বহমান এই ধারা এই শতকের প্রথমার্ধেও মোহিতলাল বুদ্ধদেব প্রমুখ কবিদের দাক্ষিণ্যে পুষ্ট ছিল। অজিত দত্তের আবেগদীপ্র প্রেমের কবিতার দোসর হালে দুর্লভ। শুধু বর্তমান জীবনের জটিলতাকে এজন্য দায়ী করলে চলবে না। সাম্প্রতিক কবিদের নিরাপত্তালোভী নির্জীব মনোবৃত্তিও এর কারণ। প্রবীণ কোনো কবি যখন এ'দের সম্পর্কে অভিযোগ করেন : 'নবীন কবির কাব্য বিস্ময়কর রূপ-সৌষ্ঠবপূর্ণ, ঋজু, বলিষ্ঠ, চমক-লাগানো হ'য়েও যেন বিজ্ঞ ও প্রবীণ-যৌবনের উত্তাপহীন। এ'দের কাব্যে যৌবন যেন এক ধাপ এড়িয়ে প্রথমেই প্রৌঢ়ত্বে পে'ৗছেছে' তখন তাঁকে দোষ দিই না। সাম্প্রতিকতম কবিতা বড় বেশি সংযত, ছিমছাম; সাবধানে পা মেপে মেপে চলাই তার অভ্যাস। সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা সেদিক থেকে ব্যতিক্রম; এবং ব্যতিক্রম ব'লেই হয়তো অনেকের কাছে কিছুটা অসংযত, কিছুটা শিথিল মনে হবে। কিন্তু তাঁর কাব্যে যে যৌবন উত্তাপ নিয়ে উপস্থিত এবং সে যৌবন সরব, সোচ্চার তাতে সন্দেহ নেই। তার মানে এই নয় যে তাঁর কবিতা অপরিস্রুত আবেগে মলিন বা স্বভাবজ শৈথিল্যে নিন্দনীয়। পরন্তু, এমন অংশও তাঁর কবিতা থেকে আবিষ্কার করা দুরূহ নয় যা দৃঢ়বদ্ধ বাক্যবিন্যাসের সংহতিতে ভাস্বর।

"নাবী ফসল"-এ কয়েকটি ত্রুটি চোখে পড়ল। এর কবি জীবনকে ভালোবাসেন; প্রেম, আনন্দ, আবেগের গান তাঁর কবিতায় ধ্বনিত। অথচ 'নাগরী লিপি' কবিতায় 'এ জীবন শুধু প্রকাণ্ড এক ধাপ্পা'-র মতো তীক্ষ্ণ জীবন-বিদ্বেষী পংক্তির সাক্ষাৎ পাচ্ছি। জীবন সম্পর্কে মাঝে মাঝে হতাশা যে জাগে না তা নয়, কিন্তু এ-হেন একটি পংক্তির উপস্থিতি, যার মধ্যে ঋজুতা থাকলেও কাব্যের পরিমাণ খুবই কম, জীবনপ্রেমী কবির কবিতাবলীর মূল সুরকে রূঢ়ভাবে কেটে দিয়েছে। এ কবিতাটি সংকলিত না হ'লেই ভালো হতো, হ'লেও পরিমার্জিত অবস্থায় সংকলিত হওয়া উচিত ছিল।

কষ্টকল্পিত মিলের কয়েকটি উদাহরণ চোখে পড়ে। অর্থাৎ মিল দেওয়ার জন্য অর্থ-হীন হ'য়ে পড়েছে অনেক অংশ। সময়কে উদ্দেশ ক'রে বলা—'দাও, দাও তোমার ত্রিভুজে একটু রেহাই দাও'—পংক্তিটির কোন্ ব্যাখ্যা সম্ভব? এ ছাড়া কবিতা শেষ করার ব্যাপারেও কিঞ্চিৎ অমনোযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণত, 'মিঠুন যোগাড়ে' কবিতা 'সূর্যের উঠোন বেয়ে যথাযোগ্য গর্বে হেঁটে যায়' পংক্তিতে সমাপ্ত হ'লে অনেক ভালো হতো। উজ্জ্বল ব্যঞ্জনাগর্ভ এই পংক্তি কবিতার পরিসমাপ্তি হিসাবে সার্থকসুন্দর।

বীরেন্দ্র এবং সুনীল চট্টোপাধ্যায় উভয়েই জীবনবোধদীপ্ত কবি। উভয়েই জীবনকে ভালোবাসেন। কিন্তু জীবনকে দেখার মধ্যে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বিদ্যমান। সুনীল

চট্টোপাধ্যায় অপেক্ষাকৃত আত্মকেন্দ্রিক, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাধারণভাবে বৃহত্তর জনতা-জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কবিকর্মের দিক দিয়ে শেষোক্তজন নিঃসন্দেহেই সিদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরিণত কবি, সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের পরিণতি এখনো সময়সাপেক্ষ।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত